সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী র.

ইসলাম ও আধুনিক অর্থনৈতিক মতবাদ

ইসলাম ও আধুনিক অর্থনৈতিক মতবাদ

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

অনুবাদ ঃ মুহাম্মাদ আবদুর রহীম

আধুনিক প্রকাশনী

ঢাকা

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১১৫১৯১; ৯৩৩৯৪৪২
E-mail : adhunikprokashoni@yahoo.com

আ. প্র. ৫

প্রথম প্রকাশ-১৯৭৬

১৭শ প্রকাশ

শাবান	১৪৩৯
বৈশাখ	১৪২৫
এপ্রিল	২০১৮

বিনিময় : ১০২.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

اسلام اور جدید معاشی نظریات —এর বঙ্গানুবাদ

ISLAM-O-ADHUNIK ARTHANAITIC MOTOBAD by Sayyid Abul A'la Mawdudi. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute,
25, Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Price : Taka 102.00 Only

বর্তমান শতকের শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তানায়ক মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী র.-এর বিখ্যাত উর্দুগ্রন্থ "ইসলাম আওর জাদীদ মায়াশী নযরিয়াত"-এর বাংলা তরজমা "ইসলাম ও আধুনিক অর্থনৈতিক মতবাদ" নামে ১৯৬১ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়।

এ গ্রন্থে লেখক বর্তমান দুনিয়ায় প্রচলিত যাবতীয় অর্থনৈতিক মতবাদ সম্পর্কে অত্যন্ত গভীর ও সূক্ষ্মভাবে মৌলিক আলোচনা পেশ করেছেন। তুলনামূলক ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাসমূহের উল্লেখের মাধ্যমে আধুনিক অর্থনৈতিক মতবাদসমূহের অন্তঃসারশূন্যতা এবং মানুষের প্রকৃত অর্থনৈতিক সমস্যার সঠিক ও সামঞ্জস্যপূর্ণ সমাধান যে একমাত্র ইসলামী অর্থ-ব্যবস্থার ভিত্তিতেই সম্ভব তা তিনি সার্থকভাবে প্রমাণ করেছেন।

এ পুস্তকখানা পাঠ করে শিক্ষিত সমাজ ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তিতে তাঁদের যাবতীয় অর্থ সমস্যার বাস্তব সমাধানে পৌঁছার জন্য উদ্বুদ্ধ হবে এটাই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

আল্লাহ আমাদের সহায় হউন।

—প্রকাশক

সূচীপত্র

পুঁজিবাদ, কমিউনিজম ও ইসলাম ---------- ১১
পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ---------- ১১
কমিউনিষ্ট অর্থব্যবস্থা ---------- ১৩
ইসলামী আদর্শ ---------- ১৬
বর্তমান তামাদ্দুনিক সমস্যার ঐতিহাসিক পটভূমি ---------- ১৯
জায়গীরদারী সামন্তবাদী সমাজব্যবস্থা ---------- ১৯
ইউরোপীয় রেনেসাঁ ---------- ২১
মধ্য যুগের লিবারেলিজম ---------- ২৩
শিল্প বিপ্লব ---------- ২৫
আধুনিক লিবারেলিজম ---------- ২৬
আধুনিক পুঁজিবাদী অর্থনীতি ---------- ২৯
অবাধ অর্থব্যবস্থার মূলনীতি ---------- ২৯
এক ঃ ব্যক্তিগত মালিকানার অধিকার ---------- ২৯
দুই ঃ উপার্জন অধিকারের স্বাধীনতা ---------- ২৯
তিন ঃ ব্যক্তিগত মুনাফাই কর্মপ্রেরণার উৎস ---------- ৩০
চার ঃ প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা ---------- ৩০
পাঁচ ঃ মালিক ও মজুরের অধিকারের পার্থক্য ---------- ৩১
ছয় ঃ ক্রমবিকাশের স্বাভাবিক কার্যকারণের উপর নির্ভরশীলতা ---------- ৩২
সাত ঃ রাষ্ট্র-সরকারের নিষ্ক্রিয়তা ---------- ৩২
বিপর্যয়ের কারণ ---------- ৩৩
সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম ---------- ৪৪
সমাজতন্ত্র ও তার মূলনীতি ---------- ৪৬
কমিউনিজম ও তার লাভ-ক্ষতি ---------- ৫০
লাভ ---------- ৫১
ক্ষতি ---------- ৫২
প্রতিক্রিয়া ---------- ৬৪
ফ্যাসীবাদ ও নাৎসীবাদ ---------- ৬৪
ভাল এবং কল্যাণকর কাজ ---------- ৬৬
নির্বুদ্ধিতা ও ক্ষতি ---------- ৬৮
পুঁজিবাদী ব্যবস্থার আভ্যন্তরীণ সংস্কার ও সংশোধন ---------- ৭১

পুঁজিবাদী সমাজের অবশিষ্ট দোষ-ত্রুটি ---------- ৭৪
ইতিহাসের শিক্ষা ---------- ৭৯
প্রকৃত সমস্যা—প্রকৃত জটিলতা ---------- ৮২
ইসলামী অর্থব্যবস্থার মূলনীতি ---------- ৮৫
এক ঃ অর্থোপার্জন উপায়ের মধ্যে জায়েয-নাজায়েযের পার্থক্য ---------- ৮৫
দুই ঃ ধন-সম্পদ সঞ্চয়ের নিষেধ ---------- ৮৬
তিন ঃ ব্যয় বিনিয়োগের নির্দেশ ---------- ৮৭
চার ঃ যাকাত ---------- ৯৩
পাঁচ ঃ মিরাসী আইন ---------- ৯৬
ছয় ঃ গনীমাত বা বিজিত সম্পদ বণ্টন ---------- ৯৭
সাত ঃ মধ্যমনীতি অবলম্বনের নির্দেশ ---------- ৯৯
আধুনিক অর্থ সমস্যার ইসলামী সমাধান ---------- ১০২
কয়েকটি মৌলিক তত্ত্ব ---------- ১০২
রোগ নিরূপণ ---------- ১০৬
ইসলামের প্রতিবিধান ---------- ১০৭
১. জমির মালিকানা ---------- ১০৭
২. অন্যান্য উৎপাদন উপায় ---------- ১১০
ইসলামের অর্থনৈতিক বিধান ---------- ১১২
যাকাত ---------- ১১৩
সীমাবদ্ধ সরকারী হস্তক্ষেপ ---------- ১১৪
ভারসাম্যপূর্ণ অর্থব্যবস্থার চারটি মূলনীতি ---------- ১১৬

بسم الله الرحمن الرحيم

পুঁজিবাদ, কমিউনিজম ও ইসলাম

বর্তমান সময় পর্যন্ত পৃথিবীতে যতগুলো অর্থব্যবস্থা রচিত হয়েছে, নীতিগতভাবে সেগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে ঃ

প্রথম–পুঁজিবাদী ব্যবস্থা।

দ্বিতীয়–কমিউনিজম।

তৃতীয়–ইসলামের উপস্থাপিত অর্থব্যবস্থা।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থা

সহজ ভাষায় বলতে গেলে পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার মূলকথা এই যে, প্রত্যেক ব্যক্তিই হবে নিজের উপার্জিত ধন-সম্পদের মালিক, তার উপার্জিত সম্পদে অন্য কারো কোনো অংশ থাকবে না, তার উপর অন্য কারো কোনো অধিকারও স্বীকৃত হবে না। তার উপার্জিত সম্পদ সে যেভাবেই ইচ্ছা ব্যয়-ব্যবহার করতে পারবে ; যে পরিমাণ ধন-সম্পদ ও উৎপাদন উপায় তার হাতে রয়েছে, তা সে কুক্ষিগত করে রাখতে এবং নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ ছাড়া অন্য কোনো কাজে তা ব্যয় করতে অস্বীকার করতে পারবে। এ ব্যাপারে তার পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে, বস্তুত প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে স্বভাবতই যে স্বার্থপরতা রয়েছে, পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা তা হতেই উদ্ভুত হয়েছে। এর পূর্ণ বিকশিত রূপ এতদূর মারাত্মক হয়ে দেখা দেয় যে, মানব সমাজের কল্যাণ ও উন্নতি বিধায়ক সমস্ত মানবীয় গুণ-গরিমা তার নিকট ম্লান হয়ে যায়। নৈতিক দৃষ্টিতে না দেখে নিছক অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে আলোচনা করলেও সুস্পষ্টরূপে দেখা যাবে যে, এ মতবাদ কোথায়ও কার্যকরী হলে ধন বণ্টনের তারতম্য অনিবার্যরূপে বিপর্যস্ত হবে। ধন-সম্পদ ও উৎপাদনের উপায়-উপাদান ক্রমশ সীমাবদ্ধ হয়ে একটি ভাগ্যবান কিংবা অধিকতর সতর্ক মানব গোষ্ঠীর কুক্ষিগত হয়ে পড়বে এবং সমাজ কার্যত দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়বে। তার একটি হবে ভাগ্যবানের দল—বিপুল ধন-সম্পদের মালিক ; আর অপরটি হবে, হতভাগ্য দরিদ্রের দল, যাদের দু' বেলা ক্ষুণ্নিবৃত্তির পরিমাণ খাদ্যও জুটে না। প্রথম শ্রেণীর লোকেরা যাবতীয় ধন-সম্পদ ও উপায়-উপাদান নিজেদের কুক্ষিগত করে নিয়ে কেবল নিজেদের আরাম, আয়েশ ও সুখ সম্ভোগের জন্য ব্যয় করবে এবং

তার পরিমাণ আরো বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে সমাজ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিতেও কুণ্ঠিত হবে না। আর দরিদ্র হতভাগ্যের দল ধন-সম্পদের সকল প্রকার অংশ ও সুযোগ সুবিধা হতে চিরতরে বঞ্চিত হবে। ধনিকদের অপরিসীম খেদমত করে জীবন যাপনের সামগ্রী সংগ্রহ করা ভিন্ন তাদের গত্যন্তর থাকে না। এ ধরনের অর্থব্যবস্থা একদিকে সূদখোর, মহাজন, শোষক, কারখানা মালিক ও যালেম জমিদার-জায়গীরদারের সৃষ্টি করে। আর অপরদিকে মজুর-কৃষকদের এক সর্বহারা বুভুক্ষুদের দল তৈরী করে। এরূপ অর্থব্যবস্থা যে সমাজে কার্যকরী হতে পারে, সেখানে স্বভাবতই সহানুভূতি, সহৃদয়তা, মায়া-মমতা, পারস্পরিক সাহায্য প্রভৃতি মানবীয় ভাবধারা এক বিন্দুও পাওয়া যাবে না। প্রত্যেক ব্যক্তিই আত্মনির্ভর হয়ে জীবন যাপনে বাধ্য হবে, কেউ কারো বন্ধু বা সাহায্যকারী হবে না। অভাবগ্রস্ত ও বুভুক্ষুদের জীবন সংকীর্ণতর হয়ে যাবে। ফলে সমাজের প্রত্যেকটি ব্যক্তিই জীবনকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য অন্যান্যদের মুকাবিলায় চরম স্বার্থপর ও প্রতিহিংসামূলক ভূমিকা অবলম্বন করতে বাধ্য হবে। প্রত্যেকেই যথাসম্ভব আর্থিক জীবিকা, উপায়-উপাদান লাভের জন্য চেষ্টা করবে, নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য তা কুক্ষিগত করবে এবং তার পরিমাণ বাড়াবার কাজেই তা ব্যয় করবে। আর যারা এ অর্থ সঞ্চয় অভিযানে ব্যর্থ হবে কিংবা তাতে পূর্ণ অংশ গ্রহণে সমর্থ হবে না, দুনিয়ার বুকে তাদের একবিন্দু আশ্রয় নেবার স্থানও মিলবে না। ভিক্ষা করতে চাইলে তা সহজলভ্য হবে না, কারো মনে তাদের প্রতি একবিন্দু অনুকম্পা জাগবে না, কোনো হস্তই তাদের সাহায্যার্থে প্রসারিত হবে না। অতপর হয় তারা আত্মহত্যা করে এ জীবন যন্ত্রণা হতে মুক্তিলাভ করবে, নতুবা নানাবিধ অপরাধ ও মানবতা বিরোধী কার্যকলাপের পংকিল আবর্তে ঝাঁপিয়ে পড়ে ক্ষুধার জ্বালা নিবৃত্ত করতে বাধ্য হবে।

পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় অর্থ সঞ্চয় এবং তাকে মুনাফাজনক কাজে ব্যয় করার দিকেই মানুষের স্বাভাবিক ঝোঁক-প্রবণতা সৃষ্টি হওয়া অনিবার্য হয়ে পড়ে। এর ফলে সেখানে লিমিটেড কোম্পানিসমূহ গজিয়ে উঠে, ব্যাংক কায়েম করা হয়, প্রোভিডেন্ট ফাণ্ড চালু করা হয়, ইনস্যুরেন্স কোম্পানী কাজ করতে শুরু করে, সমবায় সমিতিসমূহ গঠিত হতে থাকে। আর অর্থোৎপাদনের এ সমস্ত উপায় ও পন্থার পেছনে একটি মাত্র ভাবধারা কাজ করে তা হচ্ছে—"আরো অধিক অর্থোৎপাদন ও ধন সঞ্চয়" এখন এ অর্থ সঞ্চয়ের কাজ ব্যবসায়মূলক লেন-দেনের মারফতেও হতে পারে, সুদী কারবারের মাধ্যমেও হতে পারে। বস্তুত পুঁজিবাদী দৃষ্টিভংগিতে সুদ ও ব্যবসায় সংক্রান্ত লেনদেনের মধ্যে মূলগত কোনো পার্থক্য নেই। এজন্য পুঁজিবাদী সমাজে

এ দুটি জিনিস শধু যে পরস্পর মিশ্রিত হয়ে থাকে তাই নয়, বরং সকল প্রকার কাজে-কর্মে ও ব্যবসায়-বাণিজ্যে তা পরস্পর নির্ভরশীল হয়ে দাঁড়ায়। সেখানে ব্যবসায়ের জন্য সুদ ও সুদী লেনদেনের জন্য ব্যবসায় অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এর কোনো একটিও অপরটি ব্যাতিরেকে উৎকর্ষ লাভ করতে পারে না। বস্তুত সূদী কারবারের সুযোগ না থাকলে গোটা পুঁজিবাদী ব্যবস্থাই ধূলিসাৎ হয়ে যায়।

কমিউনিষ্ট অর্থব্যবস্থা

পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীত যে অর্থব্যবস্থা রয়েছে তা হচ্ছে কমিউনিষ্ট ব্যবস্থা। এ মতাদর্শের মূলকথা এই যে, ধন-সম্পদের যাবতীয় উপায়-উপাদান সমাজের ব্যক্তিবর্গের সম্মিলিত মালিকানা ব্যক্তির ব্যক্তিগতভাবে তা দখল করা, নিজের ইচ্ছামত তাতে হস্তক্ষেপ করা এবং ব্যক্তিগতভাবে তার মুনাফা গ্রহণ করার কোনো অধিকার নেই। আর ব্যক্তিগণ সমাজের মিলিত স্বার্থের জন্য যে কোনো কাজ করবে, তারা তার পারিশ্রমিক পাবে মাত্র। তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানের ব্যবস্থা সমাজের তরফ হতে করে দেয়া হবে, আর ব্যক্তিগণ তার বিনিময়ে সমাজের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করবে।

এ মতাদর্শ পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা হতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে অর্থনৈতিক সংগঠন কায়েম করে। এ সংগঠনের ব্যক্তিগত মালিকানার একবিন্দু অবকাশ নেই, কাজেই কারো পক্ষে অর্থ সঞ্চয় করা ও ব্যক্তিগতভাবে তাকে অর্থোৎপাদনের কাজে নিয়োগ করা সম্ভব নয়। এখানে আদর্শ ও নীতির দিক দিয়ে বিরাট পার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছে বলে কাজের পন্থাও পরিবর্তিত হয়ে গেছে। ব্যাংকিং, জীবনবীমা, জয়েন্টষ্টক কোম্পানী ইত্যাদি ধরনের প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন ছাড়া পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা মাত্রই চলতে পারে না। কিন্তু কমিউনিষ্ট অর্থব্যবস্থায় তার অর্থনৈতিক কার্যক্রমের ক্ষেত্রে এসব প্রতিষ্ঠানের শুধু অবকাশই নেই তা নয়, তার প্রয়োজনও নেই। পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার প্রকৃতির সাথে সূদী কারবার ও সূদী লেনদেনের গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। কিন্তু কমিউনিষ্ট অর্থব্যবস্থার সাথে ততোধিক বৈরীভাব বিরাজমান। যে কারণে সমাজের এক ব্যক্তি সূদ গ্রহণ করে এবং অপর এক ব্যক্তি তা দেয়, কমিউনিষ্ট অর্থব্যবস্থা সেই কারণেরই মূলোৎপাটন করে। তা কোনো অবস্থায় এবং কোনোরূপেই সুদকে সংগত বলে গ্রহণ করতে পারে না। বস্তুত কমিউনিষ্ট অর্থনীতিতে বিশ্বাসী কোনো ব্যক্তি একই সময় সুদী লেনদেনও করবে এবং কমিউনিষ্টও হবে, তা সম্ভব হতে পারে না।

মনে রাখা আবশ্যক যে, এখানে অবিমিশ্র আদর্শবাদের দৃষ্টিতেই কমিউনিজমের বিশ্লেষণ করা হয়েছে। অন্যথায় কার্যত কমিউনিষ্ট ব্যবস্থা রাশিয়ায় বিরাট ডিগবাজী খেয়েছে এবং তার চরমপন্থী মতাদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করতে গিয়ে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার দিকেই তার প্রত্যাবর্তন করেছে। এখন সেখানে প্রয়োজনাতিরিক্ত বেতন গ্রহণকারী লোকেরা উদ্বৃত্ত অর্থ সঞ্চয় করতে পারে এবং তা ব্যাংকে জমা রাখতে ও তার সূদ গ্রহণ করতে পারে তাতে কোনোই বাধা নেই।

বস্তুত পুঁজিবাদ ও কমিউনিষ্ট ব্যবস্থা পরস্পর বিপরীত দুই সীমান্তবর্তী আদর্শ বিশেষ। পুঁজিবাদ সমাজের ব্যক্তিগণকে তাদের স্বাভাবিক অধিকার দেয় বটে ; কিন্তু সমাজের মিলিত স্বার্থের খেদমতের জন্য অনুপ্রাণিত করার ও প্রয়োজনানুপাতে সে জন্য বাধ্য করার মত কোনো নীতি ও আদর্শ বর্তমান নেই। বরং সাধারণভাবে ব্যক্তিগণের মধ্যে তা এক প্রকারের স্বার্থপরতার মনোভাব সৃষ্টি করে। ফলে প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজ নিজ ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য সমাজ ও সমষ্টির বিরুদ্ধে কার্যত সংগ্রাম করতে উদ্বুদ্ধ হয়। এরূপ ব্যক্তি স্বার্থভিত্তিক সংগ্রামের ফলে ধন বণ্টনের ক্ষেত্রে ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়। একদিকে তখন মুষ্টিমেয় লোক গোটা সমাজ ও জাতির যাবতীয় ধন-সম্পদ ও উপায়-উপাদানকে গ্রাস করে নেয় ও লক্ষপতি-কোটিপতি হয়ে যায় এবং এ অর্থ বিনিয়োগ করে আরো অধিক অর্থ ব্যাপক ও সর্বাগ্রাসীরূপে লুণ্ঠন করতে শুরু করে। আর অপরদিকে দেশের কোটি কোটি জনগণের আর্থিক অবস্থা ক্রমশ খারাপ হয়ে যেতে শুরু করে এবং ধন বণ্টনের ক্ষেত্রে তাদের অংশ হ্রাস পেতে পেতে একেবারে শূন্যের কোঠায় পৌঁছয়। অবশ্যই এটা সত্য যে, প্রাথমিক পর্যায়ে পুঁজিবাদের বিপুল ধন-সম্পদ গৌরবময় অভিব্যক্তির মাধ্যমে সমাজ ও তামাদ্দুনের ক্ষেত্রে এক চোখ ঝলসানো চাকচিক্যের সৃষ্টি করে, কিন্তু ধন-সম্পদের অসমবণ্টনের শেষ পরিণতি স্বরূপ আর্থিক দুনিয়ার দেহে রক্তের চলাচল একেবারে রুদ্ধ হয়ে যায়, দেহের প্রায় অংশই রক্তাভাব হেতু শুকিয়ে ধ্বংস হওয়ার উপক্রম হয় এবং প্রধান দেহাংগকে অস্বাভাবিক রক্তের চাপে বরবাদ করে দেয়।

কমিউনিজম এ দোষের সংশোধন করতে চায়, কিন্তু এক নির্ভুল উদ্দেশ্যের জন্য তা অত্যন্ত ভ্রান্ত কর্মপন্থা গ্রহণ করে। তা ধন বণ্টনের সামঞ্জস্য বিধান করতে চায়, আর এটা নিসন্দেহে অত্যন্ত ভাল কাজ। কিন্তু সেই জন্য যে কর্মপন্থা গ্রহণ করে, তা দ্বারা প্রকৃতপক্ষে মানব প্রকৃতির সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়। সমাজের সাধারণ ব্যক্তিগণকে ব্যক্তিগত মালিকানা হতে বঞ্চিত

করে সমস্ত মানুষকে কেবলমাত্র সমাজ ও সমষ্টির গোলাম বানিয়ে দেয়া শুধু অর্থব্যবস্থার পক্ষেই মারাত্মক নয়, আরো ব্যাপকভাবে মানুষের গোটা তামাদ্দুনের পক্ষেও তা অত্যন্ত অকল্যাণকর। কেননা এর ফলে অর্থনৈতিক কার্যক্রমের ও তামাদ্দুনিক সংস্থার প্রাণস্পন্দনই নিস্তব্ধ হয়ে যেতে বাধ্য এবং তার আসল কর্মপ্রেরণাই নিঃশেষ হয়ে যাবে। বস্তুত তামাদ্দুন ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বার্থ মানুষকে সর্বশেষ শক্তি প্রয়োগ করে চেষ্টা-সাধনা ও সংগ্রাম করতে উদ্বুদ্ধ করে। প্রথম পর্যায়ে চিন্তা ও আদর্শবাদের ক্ষেত্রে কমিউনিজম একথা অস্বীকার করেছিল। এর চরমপন্থী দার্শনিক এতদূর বলেছিল যে, মানুষের জন্মগত ঝোঁকপ্রবণতা বলতে কোনো জিনিসের অস্তিত্ব নেই, সবকিছুই পরিবেশের সৃষ্টি এবং শিক্ষা ও সংগঠনের মারফতে আমরা ব্যক্তিস্বার্থ প্রবণতা শূন্য সামাজিকতা ও সামগ্রিকতার মনোভাব সৃষ্টি করতে পারি। কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতা কমিউনিষ্টদের এ ভুল ধারণা দূর করে দিয়েছে। বর্তমানে রাশিয়ায় কমিউনিষ্টদের মনে কর্মপ্রেরণা জাগ্রত করার জন্য ব্যক্তিস্বার্থবোধকে উৎসাহ দান করার পন্থা অবলম্বন করা হচ্ছে। বস্তুত এটা মানুষের স্বভাবজাত স্বার্থপরতা, কোনো যুক্তি, কোনো বিজ্ঞানই তার মন ও মগজের তন্ত্রীগুলো হতে এ জিনিস দূর করতে পারে না। অসাধারণ ব্যক্তিদের কথা আলাদা, মধ্যম শ্রেণীর মানুষ নিজ মন-মগজ ও হস্ত-পদ-বাহুর সমগ্র শক্তি নিয়োগ করে একমাত্র সেই কাজ করতে পারে যাতে তার নিজস্ব স্বার্থের দিক দিয়ে আগ্রহ ও সম্ভাবনা রয়েছে। এ স্বার্থের সম্ভাবনা একেবারেই যদি না থাকে এবং তাকে যদি জানিয়ে দেয়া হয় যে, তার মুনাফা ও স্বার্থের যে সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে তার ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা তার অধিক একবিন্দুও লাভ করতে পারবে না, তবে তার চিন্তা ও কর্মশক্তি একেবারে ভোঁতা হয়ে যাবে। অতপর একজন সাধারণ মজুর বা শ্রমিক হয়ে থাকা ও নির্দিষ্ট পরিমাণ মজুরী গ্রহণ করে কাটানো ছাড়া তার পক্ষে আর কিছু করা সম্ভব হবে না। বস্তুত কমিউনিষ্ট সমাজের আভ্যন্তরীণ অবস্থা এরূপই। এর বাহ্যিক ও বাস্তব দিক আরো ভয়াবহ। কমিউনিজম সমস্ত পুঁজিবাদী খতম করে একজন সর্বগ্রাসী ও সর্বশ্রেষ্ঠ পুঁজিদার সৃষ্টি করে, আর তা হচ্ছে কমিউনিষ্ট সরকার। অকমিউনিষ্ট সরকারের পুঁজিদার ব্যক্তিদের মধ্যে যে সূক্ষ্ম মানবীয় ভাবধারা ও মানবোচিত সুকোমলবৃত্তি পরিদৃষ্ট হয়, পুঁজিদার কমিউনিষ্ট সরকারের মধ্যে তার একশ ভাগের এক ভাগও খুঁজে পাওয়া যাবে না। মূলত তা নিষ্প্রাণ যন্ত্রের মতই লোকদের দ্বারা কাজ করায় এবং একটি যন্ত্রের মতই পূর্ণ স্বৈরতন্ত্র সহকারে তাদের মধ্যে জীবিকার বন্টন করে। তার নিকট কোনো সহানুভূতির স্থান নেই, দয়া-দাক্ষিণ্যের কোনো

প্রকাশ পাওয়া যায় না। এ 'যন্ত্র-মানুষকে' মানুষের ন্যায় বা মানুষ মনে করে খাটায় না বরং একটি যন্ত্রের বিভিন্ন অংশ মনে করেই ব্যবহার করে। এজন্যই সেখানকার জনগণের চিন্তা, মত ও কর্মের সমস্ত স্বাধীনতাই হরণ করে নেয়া হয়। এরূপ প্রচণ্ড স্বৈরতন্ত্র ছাড়া কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রব্যবস্থা না কায়েম হতে পারে, আর না কায়েম হয়ে এক মুহূর্তও স্থায়ী হতে পারে। কেননা মানুষের প্রকৃতিই একইরূপ সর্বাত্মক ও সর্বগ্রাসী শাসনের বিরুদ্ধে প্রত্যেকটি মুহূর্তেই বিদ্রোহ করতে উদ্যত হয়। এজন্য তাদেরকে যদি চিরন্তন স্বৈরতন্ত্রের লৌহ পিঞ্জিরে বন্দী করে না রাখা হয়, তবে কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রব্যবস্থা নিমেষে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যেতে বাধ্য। আর ঠিক এজন্যই রাশিয়ার সোভিয়েট সরকার দুনিয়ার সমস্ত সরকার অপেক্ষা অধিক নির্মম স্বৈরাচারী ও দুর্ধর্ষ। এর প্রজা সাধারণকে এমনভাবে লৌহ পিঞ্জরে বন্দী করে রাখা হয়েছে যে, দুনিয়ার কোনো রাজতান্ত্রিক কিংবা গণতান্ত্রিক সরকারে এর দৃষ্টান্ত দুর্লভ। এর এ বর্বরতা ও স্বৈরাচারিতা কেবল এজন্য নয় যে, দুর্ভাগ্যবশত ষ্টালিনের মত একজন ডিকটেটরের জন্ম হয়েছে। বরং প্রকৃতপক্ষে কমিউনিষ্ট শাসন স্বভাবতই দুর্ধর্ষ স্বৈরাচারী ও ডিকটেটরী শাসকের জন্ম দিয়ে থাকে, এটা হতে তার মুক্তি কখনো সম্ভব নয়।

ইসলামী আদর্শ

ইসলাম উল্লিখিত দুটি বিপরীত ধরনের ও পরস্পর বিরোধী অর্থব্যবস্থার মধ্যবর্তী এক সুষ্ঠু ও সুবিচারপূর্ণ ব্যবস্থা পেশ করে। তার মূলনীতি এই যে, প্রত্যেক ব্যক্তিকেই তার ব্যক্তিগত ও স্বাভাবিক অধিকার পুরোপুরিই দিতে হবে। সেই সংগে ধন-বণ্টনের ভারসাম্যকেও যথাযথরূপে রক্ষা করতে হবে। ইসলাম একদিকে ব্যক্তিকে ব্যক্তিগত মালিকানা অধিকার ও নিজের ধন-সম্পদে হস্তক্ষেপ করার অধিকার দেয়, অপরদিকে এসব অধিকার ইখতিয়ারের উপর আভ্যন্তরীণ দিক থেকে কতকগুলো নৈতিক বিধি-নিষেধ আরোপ করে এবং বাহ্যিক দিক থেকে কতকগুলো আইনের শাসন কায়েম করে। এর ফলে কোনো এক স্থানেও ধন-সম্পদ ও উপায়-উপাদান জমাট বাঁধতে ও স্থবির হয়ে থাকতে পারে না। তা প্রতিনিয়ত আবর্তিত হতে থাকে এবং তার ফলে সমাজের প্রত্যেকটি মানুষ তা থেকে প্রয়োজনীয় অংশ লাভ করার সুযোগ পায়। এজন্যই ইসলাম গোটা অর্থব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ নতুন ধরনে ও নবতর পদ্ধতিতে গড়ে তুলেছে। তার আভ্যন্তরীণ ভাবধারা, রীতিনীতি ও কর্মপদ্ধতির দিক দিয়ে পুঁজিবাদ ও কমিউনিজম উভয় অর্থব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

ইসলামের অর্থনৈতিক মতাদর্শের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই যে, ইসলামের দৃষ্টিতে অর্থনৈতিক জীবনে প্রত্যেকটি ব্যক্তির ব্যক্তিগত স্বার্থ ও সমস্ত মানুষের সামগ্রিক স্বার্থ পরস্পর গভীরভাবে বিজড়িত। এজন্য উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা-প্রতিবন্ধকতার পরিবর্তে পূর্ণ সামঞ্জস্য ও এ সহযোগিতা বর্তমান থাকা একান্তই বাঞ্ছনীয়। ব্যক্তি যদি সমাজ স্বার্থের বিপরীত চেষ্টা ও সাধনা করে জাতীয় ধন-সম্পদ নিজের কুক্ষিগত করে নেয় এবং তা সঞ্চয় করে রাখা কিংবা ব্যয় করার ব্যাপারে নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থকেই ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করে, তবে তাতে কেবল সমাজ ও সমষ্টিই ক্ষতিগ্রস্ত হবে না, বরং মূলত ও শেষ পর্যন্ত তার ক্ষতি সেই ব্যক্তিকেও প্রভাবিত করবে। অনুরূপভাবে সমাজ যদি সামগ্রিক স্বার্থরক্ষার দোহাই দিয়ে সমাজের লোকদের ব্যক্তিগত স্বার্থকে উপক্ষে করে, তবে তাতে কেবল ব্যক্তিরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে না, গোটা সমাজই তাতে ভীষণ ক্ষতির সম্মুখীন হতে বাধ্য। অতএব ব্যক্তির কল্যাণে সমষ্টির কল্যাণ হয়ে থাকে, অনুরূপভাবে সমষ্টির কল্যাণের জন্য তার অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিগণের স্বতন্ত্র অবস্থা স্বাচ্ছন্দপূর্ণ হওয়া একান্ত আবশ্যক। আর ব্যক্তি ও সমষ্টি উভয়ের কল্যাণ নির্ভর করে সমাজের লোকদের মধ্যে স্বার্থপরতা ও পরার্থপরতা বা সহানুভূতি সহৃদয়তার ভারসাম্য পুরোপুরি রক্ষিত হওয়ার উপর। প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্যই কাজ করবে, কিন্তু তা এমনভাবে করবে যেন তাতে অন্য লোকের একবিন্দু ক্ষতি সাধিত না হয়। প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে যতদূর অর্থোপার্জন করা সম্ভব তা সে নির্বিঘ্নে করবে ; কিন্তু তার উপার্জিত সম্পদে অন্য মানুষেরও অধিকার স্বীকার করতে হবে। প্রত্যেক ব্যক্তিই অপর মানুষের নিকট থেকে মুনাফা লাভ করবে, সেই সংগে সে অপর মানুষকেও মুনাফা দান করবে। মুনাফার এ বণ্টন ও ধন-সম্পদের এরূপ আবর্তন কার্যকরীভাবে রাখার জন্য ব্যক্তিদের মধ্যে কয়েকটি নৈতিক গুণ সমষ্টিই যথেষ্ট হতে পারে না, বরং সেই সমাজের আইন-কানুন এমন হতে হবে যা উপার্জন ও ব্যয়কে পূর্ণ সামঞ্জস্যের সাথে সংগঠন, নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যযুক্ত করতে পারে। তার অধীন ক্ষতিকর পন্থা ও উপায়ে অর্থোপার্জন করার কারো অধিকার থাকা উচিত নয় এবং ন্যায়সঙ্গত উপায়ে যে সম্পদ উপার্জিত হবে তা যেন নির্দিষ্ট একস্থানে একীভূত হয়ে না থাকে। বরং তার ব্যয়-বণ্টনও সুষ্ঠুভাবে আবর্তনের ব্যবস্থা কার্যকরী হওয়া একান্তই বাঞ্ছনীয়।

এ মতাদর্শের উপর যে অর্থব্যবস্থার ভিত্তিস্থাপন করা হয়েছে, তার উদ্দেশ্য কখনো এই হতে পারে না যে, মুষ্টিমেয় কয়েক ব্যক্তি কোটি কোটি টাকার মালিক হবে, আর অবশিষ্ট জনগণ অভুক্ত, অর্ধভুক্ত থাকবে ও নিস্ব

সর্বস্বহারা হয়ে যাবে, পক্ষান্তরে কোনো মানুষ কোটিপতি হতে পারবে না, মানুষের স্বাভাবিক পার্থক্যকেও জোরপূর্বক কাঁটায় কাঁটায় 'সমান' করে দেয়া হবে—এটাও কখনো তার উদ্দেশ্য হতে পারে না। বরং এ দুই চরমপন্থী নীতির মাঝখানে সম্পূর্ণ মধ্যম নীতি অবলম্বন করাই হচ্ছে তার আসল ভূমিকা। এ অর্থব্যবস্থা একদিকে সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিগত প্রয়োজন পূর্ণ করার দায়িত্ব গ্রহণ করে, অপরদিকে সমাজে সামগ্রিক দায়িত্ব পালনেরও নিরবচ্ছিন্ন সুযোগ করে দেয়। এ সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিই যদি অপরকে ক্ষতিগ্রস্ত না করেই নিজের স্বাভাবিক সীমার মধ্যে থেকে অর্থোপার্জনের জন্য চেষ্টা করে এবং উপার্জিত ধন-সম্পদ ব্যয় করার ব্যাপারে যদি মিতব্যয়িতা ও পারস্পরিক সাহায্য নীতি অনুসরণ করে চলে, তাহলে সেই সমাজে পুঁজিবাদী সমাজের ন্যায় অর্থনৈতিক অসাম্য ও আকাশছোঁয়া আর্থিক পার্থক্য কখনোই সৃষ্টি হতে পারে না। কেননা এ ধরনের অর্থব্যবস্থা যেমন কাউকে কোটিপতি হতে বাধা দেয় না, তেমনি এ সমাজে কেউ কোটিপতি হয়েও সহস্র লক্ষ মানুষের অনশন-অর্ধাশনের কারণ হতে পারে না। পক্ষান্তরে এ অর্থব্যবস্থা সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিকেই আল্লাহ্র অজস্র নিয়ামতের অংশীদার হবার সুযোগ দেয়, কিন্তু নিজের স্বাভাবিক যোগ্যতা ও কর্মক্ষমতা অনুযায়ী অর্থোপার্জনে কৃত্রিম বাধা প্রতিবন্ধকতা আরোপ করাও এর নীতির সম্পূর্ণ বিপরীত।

❒

বর্তমান তামাদ্দুনিক সমস্যার ঐতিহাসিক পটভূমি

একথা সর্বজনবিদিত যে, নিকট অতীতকালে বিশ্বের চিন্তা ও আদর্শবাদ এবং বাস্তব ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব একমাত্র পাশ্চাত্যবাসীদেরই কুক্ষিগত হয়েছিল। ঠিক সেই জন্যই পাশ্চাত্য জগতে ও জীবনে যেসব সমস্যা দেখা দিয়েছে এবং সেসব সমস্যার কারণে যেসব জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে, তারই স্বাভাবিক পরিণতিস্বরূপ আমাদের রাজনৈতিক, তামাদ্দুনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অনুরূপ অসংখ্য সমস্যা ও জটিলতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। সেই সংগে এটাকেও তারই স্বাভাবিক ফল বলে মনে করতে হবে যে, আমাদের অধিকাংশ চিন্তাশীল ও সমঝদার লোকই এসব সমস্যার সমাধানের জন্য পাশ্চাত্যের চিন্তাশীল ও সুদক্ষ পরিচালকগণের উপস্থাপিত পন্থা থেকে পথনির্দেশ গ্রহণ করার জন্য উদগ্রীব হয়ে রয়েছে। এজন্যই বর্তমান সামাজিক ও তামাদ্দুনিক সমস্যাসমূহের ঐতিহাসিক পটভূমির উপর আলোকপাত করা একান্তই অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। সেই সংগে আধুনিক সমস্যাসমূহের সমাধানের জন্য সাধারণভাবে যেসব পন্থা পেশ কিংবা অবলম্বন করা হয়, আমরা তারও উৎপত্তির ইতিহাস আলোচনা করে দেখতে চেষ্টা করবো। এ ঐতিহাসিক আলোচনার আলোকে আমাদের আসল বক্তব্য হৃদয়ংগম করা খুবই সহজ হবে বলে মনে করি।

জায়গীরদারী সামন্তবাদী সমাজব্যবস্থা

খৃস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে পাশ্চাত্যে রোমান সাম্রাজ্য ব্যবস্থা যখন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল, তখন ইউরোপের তামাদ্দুনিক, রাজনৈতিক ও অর্থেনৈতিক ঐক্য ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। বিভিন্ন জাতি ও রাজ্যকে পরস্পর মিলিয়ে রাখার মূলসূত্রই ছিড়ে গেল। আর যেসব কারণে এ সম্পর্ক ও সম্বন্ধ বজায় রাখা সম্ভব হয়েছিল, তাও বিলুপ্ত হয়ে গেল। রোমীয় আইন, রোমীয় সর্বগ্রাসী সামাজ্যবাদ ও রোমকদের রাজনৈতিক চিন্তাধারার একটি চিত্র পাশ্চাত্যবাসীদের মন-মগযে যদিও মুদ্রিত ছিল ; কিন্তু মূল সাম্রাজ্য ধ্বংস হওয়ার ফলে সমগ্র ইউরোপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হয়ে পড়লো। এক একটি ভৌগলিক এলাকা অসংখ্য খণ্ডে খণ্ডিত হয়ে গেল, কোথাও একই বংশ ও একই ভাষাভাষী লোকেরা পর্যন্ত ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকতে পারলো না, সমগ্র সাম্রাজ্য এমনভাবে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন ও বিভক্ত হয়ে গেল যে, তার প্রত্যেকটিরই ব্যবস্থাপনা ও শাসন কার্যত স্থানীয় ভিত্তিতে কোনো প্রধান

কিংবা সামন্তের দ্বারাই সম্পন্ন হওয়া সম্ভব ছিল। এ সমাজ ব্যবস্থায় ক্রমশ যেসব বৈশিষ্ট্য দেখা দিয়েছিল এবং পরবর্তী পর্যায়ে যা অত্যন্ত দৃঢ়তা লাভ করেছিল, তা এখানে পর্যায়ক্রমে উল্লেখ করা যাচ্ছে ঃ

এক ঃ জমির মালিকানাই হলো শাসন ক্ষমতা লাভের ভিত্তি। সমস্ত ইযযত, প্রাধান্য ও প্রভুত্ব চিরস্থায়ী বন্দোবস্তস্বরূপ কেবলমাত্র ভূমি মালিকদের জন্য নির্দিষ্ট রইলো। তারাই নিজ নিজ এলাকার শান্তি ও শৃংখলা রক্ষার কর্তৃত্ব লাভ করলো। সমাজ প্রধান, জায়গীরদার কিংবা বাদশাহর সাথে তাদেরই সরাসরি সম্পর্ক স্থাপিত হলো। আর সেই অঞ্চলের ভূমিহীন কৃষক, শিল্পজীবি ও ব্যবসায়ীগণ তাদের পৃষ্ঠপোষকতার অধীন নিতান্ত প্রজা হয়ে জীবনযাপন করতে বাধ্য হলো। এ প্রজাগণের মধ্যে আবার বিভিন্ন শ্রেণীর সৃষ্টি হলো, কেউ হলো উঁচুদরের প্রজা, আর কেউ নিম্নশ্রেণীর। অতপর এ শ্রেণী বিভাগ এবং অদ্ভুত সম্মান মর্যাদা ও অধিকার পার্থক্য তদানীন্তন সমাজের গভীর প্রদেশে সুদৃঢ়রূপে শিকড় গেড়েছিল। এভাবে জায়গীরদারী সামন্তবাদী সমাজ একটি সিঁড়ির মর্যাদা লাভ করে। তার প্রত্যেক উপরের স্তরে আসীন ব্যক্তি প্রত্যেক নিম্নস্তরের অবস্থিত ব্যক্তির খোদা এবং নিম্নস্তরের ব্যক্তিরা উপরের স্তরে আসীন ব্যক্তির দাস হয়ে পড়েছিল। তার মধ্যে এলাকার সামন্ত পরিবারের স্থান হচ্ছে সর্বোচ্চ, আর সর্বনিম্নে হচ্ছে দেশের সেইসব গরীব জনগণের স্থান, যারা কোনো দিনই কারো উপর নিজেদের প্রভাব-প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ লাভ করেনি।

দুই ঃ খৃস্টানদের গীর্জা তখন সবেমাত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। গীর্জা কর্তৃপক্ষ আল্লাহর নাম ভাঙ্গিয়ে মানুষের সাথে কথা বলতো, যদিও তাদের নিকট কোনো খোদায়ী আইন ও হেদায়াতের কোনো মূলনীতি আদৌ বর্তমান ছিল না। এসব প্রতিষ্ঠিত গীর্জাও বিকাশমান জায়গীরদারী সামন্তবাদী ব্যবস্থাকে পুরোপুরি সমর্থন করে বসলো এবং এর আনুসংগিক হিসেবে যেসব ঐতিহ্যসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান অধিকার, পার্থক্য-বৈষম্য ও বিধি-নিষেধ তদানীন্তন সমাজে সুদৃঢ়রূপে শিকড় গেড়ে বসেছিল, তাদের সবকিছুকেই ধর্মীয় সার্টিফিকেট দান করলো। প্রত্যেকটি প্রাচীন মতই গীর্জার আকীদার মর্যাদা লাভ করলো এবং তার বিপরীত কোনো কথা চিন্তা করাও কুফরি বলে অভিহিত হতে লাগলো। একবারের জন্য যে প্রথাই চালু হয়ে পড়লো, তাই শরীয়াতে পরিণত হলো এবং তার বিরুদ্ধাচরণে আল্লাহ, রাসূল এবং তাঁর দীনের বিরুদ্ধাচরণ করা হয় বলে ধারণা করতে লাগলো। সাহিত্য, দর্শন, সমাজ, রাজনীতি ও অর্থনীতি প্রভৃতি জায়গীরদারী সামন্তবাদী ব্যবস্থায় যে রূপ পরিগ্রহ করেছে, গীর্জা তাকে খোদা প্রদত্ত রূপ বলে ঘোষণা করলো এবং এ

কারণেই তার বিন্দুমাত্র পরিবর্তন চেষ্টাও কেবল অপরাধই শুধু নয়—পরিষ্কার হারাম হয়ে গেল।

তিন ঃ বড় বড় রাজপথ প্রস্তুত করা, তাকে সঠিক অবস্থায় বর্তমান রাখা এবং তাতে শান্তি বা নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করার মতো কোনো কেন্দ্রীয় শক্তির শাসন তখন বর্তমান ছিল না। এজন্য দীর্ঘ পথ সফর করা, বিরাট ও ব্যাপক আকারে ব্যবসায়-বাণিজ্য করা, বিপুল পরিমাণে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুত ও পরিবেশন করা প্রভৃতি ধরনের যাবতীয় তৎপরতাই বন্ধ হয়ে গেল এবং ব্যবসায়, শিল্প ও মানুষের মনোবৃত্তিও জায়গীরদারদের শাসন এলাকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভৌগলিক পরিসীমার মধ্যে সংকুচিত হয়ে গেল।

চার ঃ শিল্প ও ব্যবসায়ের এক একটি বিভাগ এক একজন ব্যবসায়ী ও পেশাদারী কারবারী গোষ্ঠী উপনিবেশে পরিণত হলো। এ গোষ্ঠীর কোনো ব্যক্তিই তার পূর্বতন পেশা যেমন ত্যাগ করতে পারতো না, তেমনি বাইরের লোকও এ গোষ্ঠীর মধ্যে প্রবেশ করার সুযোগ পেতো না। প্রত্যেকটি গোষ্ঠীর নিজ নিজ কাজকে নিজেদেরই ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ পরিসরের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করতো। পণ্যদ্রব্য অবিলম্বে ও স্থানীয় প্রয়োজন পূরণের জন্যই প্রস্তুত হতো। তবে আশপাশের এলাকায়ও তা বিক্রি হতো এবং অন্যান্য দ্রব্যাদির সংগে তার বিনিময়ও হতো। এসব বিভিন্ন কারণে উন্নতি, বিস্তৃতি, আবিষ্কার-উদ্ভাবনী, টেকনিকেল সংশোধন ও পুঁজি সমাবেশের পথ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

রোমান সাম্রাজ্যের পতনের ফলে এ ধরনের যেসব দোষ-ত্রুটি দেখা দিয়েছিল, মহান রোম সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা এটা কিছুমাত্র দূর করতে পারলো না। পোপ ও কাইজার আধ্যাত্মিক, নৈতিক এবং অনেকটা রাজনৈতিক দিক দিয়ে ইউরোপকে এক ঐক্যসূত্র দান করেছিল বটে ; কিন্তু জায়গীরদারী সামন্তবাদী ব্যবস্থার সমাজ, তামাদ্দুন ও অর্থনীতির যে দূরবস্থা হয়েছিল, তা যে পরিবর্তন হয়নি কেবল তাই নয় ; বরং তা এমন এক সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হলো যে, তাছাড়া জীবনব্যবস্থার অন্য কোনো পন্থাই হতে পারে—তা কল্পনা পর্যন্ত করা সম্ভব হতো না।

ইউরোপীয় রেনেসাঁ

এ সর্বগ্রাসী জড়তা কিরূপে এবং কোন্ সব কারণে টুটে গেল এবং ইউরোপের সর্বাত্মক রেনেসাঁ আন্দোলন কিরূপে মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো তা আমাদের আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে সংক্ষেপে বলা যায়, একদিকে স্পেন ও আন্দালুশিয়ার উপর মুসলিম আধিপত্য এবং অপরদিকে

ক্রুশযুদ্ধ পাশ্চাত্যবাসীদের তদানীন্তন দুনিয়ার তাহযীব তামাদ্দুনের অগ্রদূত জাতিগুলোর সম্মুখীন করে দিয়েছিল। খৃষ্টান গীর্জার প্রভাবে পাশ্চাত্যবাসীদের চোখের উপর যে পর্দা পড়েছিল, তা যদিও তাদেরকে সরাসরি ইসলামের দিকে আকৃষ্ট হতে বাধা দান করেছিল ; কিন্তু তবুও মুসলমানদের সাথে তাদের যোগাযোগ স্থাপনের ফলে চিন্তাধারা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও উন্নত ধরনের কর্মপদ্ধতির এক বিরাট সম্পদ তারা লাভ করতে পেরেছিল এবং শেষ পর্যন্ত তাই এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করেছিল।

চতুর্থ শতাব্দী থেকে ষষ্ঠদশ শতাব্দী পর্যন্ত সময় ইউরোপের ইতিহাসে মধ্যযুগ হতে আধুনিক যুগের দিকে অগ্রসর হওয়ার এক অন্তর্বর্তী কাল বলে প্রখ্যাত। এ সময় পাশ্চাত্যবাসীদের জীবনের প্রত্যেকটি দিকই বাইরের জগতের প্রভাবে সক্রিয় হয়ে উঠে।

কৃষি বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান, অংকশাস্ত্র, ইঞ্জিনিয়ারিং ও অন্যান্য বিভাগে পাশ্চাত্যবাসীদের জ্ঞান বৃদ্ধি পেতে থাকে। প্রেসের আবিষ্কার, চিন্তার প্রসার ও জ্ঞান বিস্তারের গতিকে অত্যন্ত তীব্র করে দিল। জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অপূর্ব জাগরণের সাথে সাথে বাধ্যতামূলকভাবে জীবনের প্রত্যেকটি সমাজে সমালোচনা ও সংশোধনমূলক কর্মতৎপরতা অব্যাহতভাবে চলতে শুরু করলো। নূতন জ্ঞান ও তথ্যের অব্যাহত গতি এবং শিল্প, কৃষি ও ব্যবসায় সাধারণভাবে গোটা তামাদ্দুনকেই নূতন প্রাণে উজ্জীবিত করে তুললো। তদুপরি নূতন ভৌগলিক এলাকার সন্ধান লাভের ফলে চিন্তা ও দৃষ্টির প্রসারতা ঘটলো। সেই সাথে দূরবর্তী দেশসমূহে পাশ্চাত্যবাসীদের জন্য এমন সব নূতন বাজার সৃষ্টি হতে লাগলো যেখানে তাদের নিজস্ব পণ্য দ্রব্যাদি, কাঁচামাল বিক্রি করার এবং অন্যান্য দেশের শিল্পোৎপন্ন দ্রব্যাদি ও কাঁচামাল ক্রয়ের সুযোগ লাভ করলো। এ বিরাট অপূর্ব সুযোগে শতাব্দীকালের অচল ব্যবসায়সমূহ নূতন করে চলতে শুরু করলো। শত বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও ইউরোপের ভিতর ও বাহির সর্বত্র আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ীদের আনাগোনা শুরু হয়ে গেল। বড় বড় রাজপথে ও কেন্দ্রীয় স্থানসমূহে নূতন বাজার ও শহর-নগর গড়ে উঠতে লাগলো। সম্পদ, শক্তি, মেধা, সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলো ক্রমশ জায়গীর ও ক্ষুদ্র সামন্ত রাজ্যাধীন উপ-শহর থেকে বড় বড় শহরে স্থানান্তরিত হতে লাগলো। কেননা এটাই ব্যবসায়, শিল্প ও নূতন জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্যের লীলাকেন্দ্রে পরিণত হতে শুরু করেছিল।

এ নূতন জাগরণের অগ্রদূত ছিল 'বুর্জোয়া' শ্রেণীর লোকেরা। আর সওদাগর-মহাজন, শিল্পী ও সামুদ্রিক ব্যবসায়ীরা ছিল এদের মধ্যে প্রধান। এ

নবতর উন্নতির সমস্ত সুযোগ একমাত্র তারাই লাভ করেছিল। শহরে নগরে এরাই ছিল প্রতিষ্ঠিত। বহির্বিশ্বের সাথে যোগাযোগ ও যাতায়াত এদের ছিল, অন্তত বহিঃপ্রভাবের প্রথম স্পর্শ এদের দেহে লেগেছিল এবং সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন ও উন্নতি লাভের আকুল উন্মাদনা এদের মধ্যেই জাগ্রত হয়েছিল। কিন্তু গীর্জা ও সামন্তবাদীদের যোগসাজশে চিন্তা, নৈতিকতা, ধর্ম, সমাজ, রাজনীতি ও অর্থনীতির দিক দিয়ে যেসব বাধা ও প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়েছিল, তা তাদেরকে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হতে ও উন্নতি লাভ করতে চারদিক থেকে বাধা প্রদান করতো। জীবনের যে কোনো বিভাগেই এরা শতাব্দীকালের প্রতিষ্ঠিত সীমার বাইরে পদক্ষেপ করতো, পাদ্রী ও জায়গীরদারগণ মিলিতভাবে এদের পথরোধ করে দাঁড়াতো। এজন্য এ শক্তির বিরুদ্ধেই এক সর্বাত্মক দ্বন্দ্বের সূচনা হলো এবং এ চৌমুখী লড়াই জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রেই শুরু হয়ে গেল। জ্ঞান ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে গীর্জার স্থাপিত 'মানসিক' স্বৈরতন্ত্রকে চ্যালেঞ্জ করা হলো এবং চিন্তার স্বাধীনতা ও অনুসন্ধান প্রয়োজনীয়তার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হলো। অর্থনীতি, সমাজব্যবস্থা ও রাজনীতির ক্ষেত্রে জায়গীরদারদের প্রভাব-প্রতিপত্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে উঠলো এবং জায়গীরদারী সামন্তবাদী সমাজব্যবস্থায় যেসব ভেদ-বৈষম্য স্থাপিত ছিল, তার বিরুদ্ধে তীব্র আওয়াজ উঠানো হলো। এর ফলে প্রাচীন সমাজব্যবস্থা পশ্চাদাপসরণ করতে ও নবতর উত্থানমুখী শক্তিসমূহ অগ্রসর হতে লাগলো। ষষ্ঠদশ শতাব্দী আসতে না আসতেই ইউরোপের বিভিন্ন দেশের ক্ষুদ্রাকার জায়গীরগুলো চূর্ণ হয়ে বড় বড় জাতীয় রাষ্ট্রে রূপায়িত হতে লাগলো। ইউরোপের আধ্যাত্মিক প্রভাব ও প্রতিপত্তির ধাঁধা টুটে গেল এবং নূতন জাতীয় রাষ্ট্রের ধর্মহীন শাসকগণ গীর্জার নিজস্ব মালিকানা সম্পদসমূহ ক্রোক করে নিতে শুরু করলো। এক বিশ্বব্যাপক ধর্মব্যবস্থা পরিত্যাগ করে বিভিন্ন জাতি নিজস্ব জাতীয় গীর্জা রচনায় আত্মনিয়োগ করলো। এভাবে গীর্জা ও জায়গীরদারের যুক্ত আধিপত্যের বাঁধন ছিন্ন হওয়ার সাথে সাথে প্রাচীন সমাজব্যবস্থা সৃষ্ট সামাজিক ও ঐতিহ্যগত বাধা-বন্ধন থেকে বুর্জোয়া শ্রেণী সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হলো।

মধ্যযুগের লিবারেলিজম

গীর্জা ও সামন্তবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যেসব মতবাদকে ভিত্তি করে লড়াই করা হয়েছিল, সেই সবের সমষ্টিগত শিরোনাম হচ্ছে 'লিবারেলিজম'—অন্য কথায় সীমাহীন উদারতা। নবযুগের অগ্রদূতগণ জীবনের প্রত্যেকটি বিভাগ এবং চিন্তা ও কর্মের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই সম্প্রসারণশীলতা, অকুণ্ঠ দান, ব্যবহার ও অবাধ উদারতার নসীহত করে বেড়াতো। ধর্ম, দর্শন, জ্ঞান-

বিজ্ঞান, সমাজ, তামাদ্দুন, রাজনীতি ও অর্থনীতি প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই উদারনীতি অবলম্বন করা হয়েছিল। তারা প্রগতিপন্থীদের পথ থেকে সকল প্রকার বাধা-বন্ধন, প্রতিবন্ধকতা-সংকীর্ণতা ও কঠোরতাকে অপসারিত করতে সচেষ্ট হয়েছিল।

এ দ্বন্দ্ব-সংগ্রামে একদিকে যেমন গীর্জা কর্তৃপক্ষ ও সামন্তবাদীদের সংকীর্ণমনতা চরম পর্যায়ে পৌঁছেছিল, তেমনি বুর্জোয়াদের সীমাহীন শংকাহীন উদারতা অপর এক চরম সীমান্তে উপনীত হয়েছিল। উভয় দিকেই চরম স্বার্থপরতা তীব্র আকার ধারণ করেছিল। সততা, ইনসাফ, নির্ভুল জ্ঞান-বিজ্ঞান, সুষ্ঠু ও নির্দোষ চিন্তার সাথে এদের কারো একবিন্দু সম্পর্কও ছিল না। একদল যেখানে ভিত্তিহীন ধারণা-বিশ্বাস, অসংগত বৈষম্য-পার্থক্য ও অমানুষিক জোর-যুলুম লব্ধ অধিকার সংরক্ষণ করতে গিয়ে আল্লাহ, দীন ও নৈতিকতার নাম ব্যবহার করেছিল, সেখানে অপরপক্ষ নিতান্ত জিদের বশবর্তী হয়ে স্বাধীন চিন্তা ও উদারতার নামে ধর্ম ও নৈতিকতার চিরস্বীকৃত সত্যতার বুনিয়াদকে শিথিল করে দিতে শুরু করেছিল। ঠিক এ সময়ই রাজনীতির সাথে নৈতিকতার চির সমর্থিত সম্পর্ক ছিন্ন করা হয়। মেকিয়াভেলী প্রকাশ্যভাবে এ মতবাদের ওকালতি করে বলতে লাগলো যে, রাজনৈতিক স্বার্থ ও সুযোগ-সুবিধা লাভের ব্যাপারে নৈতিক নিয়মনীতি মেনে চলার কোনো প্রয়োজনীয়তাই থাকতে পারে না। এ যুগেই গীর্জা ও সামন্তবাদের মুকাবিলায় জাতীয় রাষ্ট্রের মূর্তি রচনা করা হয় এবং বর্তমান পৃথিবীতে ঝগড়া ও আন্তর্জাতিক শত্রুতার যে মারাত্মক আগ্নেয়গিরি সৃষ্টি হয়েছে, তার বিষবাষ্প সেই দিন থেকেই পুঞ্জিভূত হতে শুরু করে। এ সময় থেকে সুদকে সর্বপ্রথম জায়েয মনে করা হতে থাকে। অথচ আবহমানকাল থেকে সমগ্র দুনিয়ার ধর্মবিশ্বাসী, নৈতিকবোধ সম্পন্ন লোক ও আইনবিদদের মধ্যে সুদ হারাম হওয়া সম্পর্কে পূর্ণ মতৈক্য বিদ্যমান ছিল। কেবল তাওরাত ও কুরআন মজীদই সুদকে হারাম ঘোষণা করেনি, এরিস্টটল ও প্লেটোও তাকে হারাম বলে মনে করতেন। গ্রীক ও রোমীয় আইনের দৃষ্টিতেও এটা নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু রেনেসাঁর যুগে বুর্জোয়া শ্রেণী যখন খৃস্টান গীর্জার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন করে, তখন থেকে সুদকে এক 'অপরিহার্য পাপ' বলে অভিহিত করা শুরু করে। এমনকি শক্তিশালী প্রচার প্রোপাগাণ্ডায় প্রভাবান্বিত হয়ে খৃস্টান সংস্কার পন্থীরাও (Reformists) মানবীয় দুর্বলতা হিসেবে একে জায়েয মনে করতে শুরু করলো। অতপর ধীরে ধীরে বিশিষ্ট চিন্তাবিদগণের সমস্ত নৈতিক কথাবার্তা সুদের হার কি হওয়া উচিত তার মধ্যেই কেন্দ্রীভূত হলো। সুদের হার 'যুক্তিসংগত' হওয়া উচিত—এ বিতর্কের

উপরই তারা সমস্ত গুরুত্ব আরোপ করলেন। শেষ পর্যন্ত এ ধারণা তাদের মনে বদ্ধমূল হয়ে বসলো যে, ব্যবসায়-বাণিজ্যে ও কারবারের ক্ষেত্রে ধর্ম ও নৈতিকতার কোনো প্রশ্নই থাকতে পারে না। অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে সুদ অত্যন্ত স্বাভাবিক ও যুক্তিসংগত জিনিস। বাড়ী ভাড়া দেয়া-নেয়ার বিরুদ্ধে যেমন কিছু বলা যায় না, সুদের বিরুদ্ধেও তেমনি কোনো অকাট্য যুক্তি পেশ করা যেতে পারে না।

বিশেষ মজার ব্যাপার এই যে, রেনেসাঁ যুগে এ বুর্জোয়া শ্রেণী নিজেদের অবাধ ও অকুণ্ঠ উদারতার আওয়ায তুলে পাদ্রী, সামন্ত ও ভূমি মালিকদেরকে যতখানি ময়দান হতে বেদখল করে দিয়েছিল তারা এসে সেই শূন্য স্থানই দখল করে বসলো। তাদের চরম উদারতার নেশা তাদেরকে একথা ভুলিয়ে দিয়েছিল যে, তাদেরও নীচে জনগণের একটি বিরাট শ্রেণী বর্তমান রয়েছে এবং সামন্তবাদী ব্যবস্থার জগদ্দল পাথর তাদেরকেই সর্বাধিক নিষ্পেষিত করেছে। অতএব বর্তমানের এ লিবারেল (উদার) সমাজব্যবস্থার বিরাট ফায়দার একটা অংশ লাভ করার অধিকার তাদেরও রয়েছে। ইংল্যাণ্ডে যখন পার্লামেন্টারী শাসনের সূচনা হয় এবং পার্লামেন্টের প্রকৃত ক্ষমতা লর্ডদের হাত থেকে নির্গত হয়ে জনগণের (কমন্স) হাতে আসে, তখন এ সমস্ত ক্ষমতা-ইখতিয়ার উদারপন্থী বুর্জোয়ারাই কুক্ষিগত করে নেয়। যেসব যুক্তির বলে তারা নিজেদের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছিল, নিম্ন শ্রেণীর জনগণকে ভোটাধিকার দানের কথা অস্বীকার করার সময় তারা সেইসব যুক্তি একেবারে ভুলে গিয়েছিল।

শিল্প বিপ্লব

রেনেসাঁ যুগে যে বিপ্লবের সূচনা হয়েছিল, অষ্টাদশ শতাব্দীতে যন্ত্র আবিষ্কারের ফলে তার শতগুণ বৃদ্ধি পেল। অভিনব বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, তথ্য ও আবিষ্কার উদ্ভাবনীকে শিল্প, কৃষি ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে প্রয়োগ করা হলো। তখন পণ্যোৎপাদন, কাঁচামাল সংগ্রহ ও বিশ্বের কোণে কোণে উৎপণ্য পণ্যের বিক্রয় ব্যবস্থা অস্বাভাবিকভাবে কার্যকরী হতে লাগলো।

এ বিরাট বিপ্লব স্বাচ্ছন্দ্য, শক্তি-সামর্থ ও ক্ষমতা-প্রভুত্বের যেসব সুযোগ সুবিধার দ্বার উন্মুক্ত করে দিল, তার সবটুকু শুধু রেনেসাঁ যুগে উদ্ভূত বুর্জোয়া শ্রেণীই লুটে নেবার সুযোগ পেল। কেননা শিল্প ও বাণিজ্য তাদেরই কুক্ষিগত ছিল। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্যের উপরও একমাত্র তাদের একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তৃত ছিল। তারা পুঁজি, কর্মকুশলতা ও সাংগঠনিক যোগ্যতা—এ তিনটির সমন্বয়ে শিল্প ও বাণিজ্যের এক নবতর ব্যবস্থা রচনা করে নিলো, যার

নাম 'আধুনিক পুঁজিবাদ'। এ ব্যবস্থার অধীন শহর নগরে বড় বড় কল-কারখানায় ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হলো। পেশাদারীদের গোষ্ঠীবাদ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। ছোট ছোট কারখানা, ব্যক্তিগত কারবার ও স্বল্প পুঁজি মালিক দোকানীদের ক্ষেত্র পরিধি সংকীর্ণতর হয়ে গেল। গ্রাম-পল্লীর শ্রমজীবিরা শহরে এসে ভীড় জমাতে ও বড় কারখানা মালিকদের দ্বারদেশে শ্রমজীবি ও দিনমজুর হিসেবে দাঁড়াতে বাধ্য হলো। ক্ষুদ্রাকারের ব্যবসায়ী ও কারবারী লোকদের পক্ষে বড় শিল্পপতি ও বড় আকারের ব্যবসায়ীদের চাকুরী কিংবা এজেন্সী গ্রহণ ছাড়া গত্যন্তর রইলো না। ফলে বিজ্ঞানের নব আবিষ্কারলব্ধ সমগ্র শক্তিকে একমাত্র বুর্জোয়ারাই করায়ত্ত করে নিলো এবং তাদের প্রভাব পরিধি অধিকতর সম্প্রসারিত হতে শুরু করলো।

অবশ্য এ পরিধি সম্প্রসারণের পথে রেনেসাঁ আন্দোলন সৃষ্ট জাতীয় রাষ্ট্রগুলো সর্বাপেক্ষা বড় বাধা হয়ে দেখা দিল। এসব রাষ্ট্রের স্বৈরাচারী বাদশাহ 'খোদাপ্রদত্ত অধিকার' সম্পন্ন হওয়ার দাবী করছিল। প্রাক্তন সামন্তবাদী ব্যবস্থার প্রধানগণ এ বাদশাহদের পদলেহী হয়ে বসলো এবং জাতীয় গীর্জা তাদের পক্ষে ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক পৃষ্ঠপোষক হয়েছিল। আর এ মৈত্রীত্রয়ের প্রভুত্ব বুর্জোয়াদের পথে নানা প্রকারের বাধা-প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করতে লাগলো। এ বাধা-প্রতিবন্ধকতা কেবল শিল্প ও ব্যবসায়ের ক্ষেত্রেই এর অগ্রগতি রোধ করছিল না, তামাদ্দুন ও সমাজ ক্ষেত্রেও সামন্তবাদী আমলের এমন অনেক জিনিসই অবশিষ্ট ছিল, যা এ উত্থানমুখী শ্রেণীর পক্ষে ছিল দুঃসহ ব্যবস্থা।

আধুনিক লিবারেলিজম

এ যুগে পূর্ববর্তী যুদ্ধ বিজেতা 'লিবারেলিজম' নবতর অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। রাজনীতির ক্ষেত্রে ধর্মহীনতা, তামাদ্দুন, সমাজ, সাহিত্য ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নিরংকুশ ব্যক্তি স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অবাধ উন্মুক্ত নীতির (Laissez fair policy) শিংগা ফুঁকতে শুরু করলো। সে ঘোষণা করলো যে, গীর্জা, রাষ্ট্র, সমাজ—কারোও ব্যক্তির বিকাশ-প্রচেষ্টা ও লাভবান হওয়ার অনুকূল কর্মতৎপরতার পথে বাধা সৃষ্টি করার কোনোই অধিকার থাকতে পারে না। প্রত্যেক ব্যক্তি স্বীয় শক্তি-সামর্থ ও যোগ্যতাকে নিজের ঝোঁকপ্রবণতা অনুযায়ী ব্যবহার করার ও সাধ্যমত অগ্রগতি ও উন্নতি লাভ করার অবাধ সুযোগ লাভ হওয়া একান্তই আবশ্যক। আর বস্তুতই প্রত্যেক ব্যক্তি যদি সীমাহীন স্বাধীনতা লাভ করতে পারে—জীবনের প্রত্যেকটি বিভাগ ও ক্ষেত্রে এবং প্রত্যেকটি কর্মপথে নিরংকুশ

আযাদী ভোগ করতে পারে তবে তাতে মূলত সমাজেরই সকল প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয়। সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিরই সকল ব্যাপারে বাহ্যিক প্রভাব-প্রতিবন্ধকতা, নিয়ম-নীতি, অনুষ্ঠানের বন্ধন, ধর্মীয় ও নৈতিক বিধিনিষেধ, আইন ও সমাজের হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

এভাবে নূতন মতের সমর্থক-ঝাণ্ডাবাহকগণ সর্বত্র উদারতা, নিবন্ধকতা, সবকিছুই সংগত হওয়া, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র—তাদের পরিভাষায়, বুদ্ধিসম্মত ও যুক্তিসংগত হওয়ার শ্লোগান কার্যকরি করার জন্য পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করলো।

রাজনীতির ক্ষেত্রে তারা সরকারের ক্ষমতা সর্বাপেক্ষা কম ও ব্যক্তির আযাদী বিশাল ও সীমাহীন হওয়ার আদর্শে বিশ্বাসী ছিল। তাদের মতে সরকার শুধু একটি সুবিচারক শক্তি হবে মাত্র। ব্যক্তিদের পরসীমায় পারস্পরিক অনুপ্রবেশকে বাধা দিবে ও ব্যক্তিগত আযাদীর রক্ষণাবেক্ষণ করবে। আর তামাদ্দুন ও অর্থনৈতিক জীবনের যাবতীয় কার্যক্রম সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিগণের স্বাধীন নিরংকুশ কর্মপ্রচেষ্টা ও চিন্তা-গবেষণার ভিত্তিতে সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক। এ ব্যাপারে সরকার কার্যকরী শক্তি ও পথপ্রদর্শক—কোনো এক হিসেবেই বিন্দুমাত্র হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। রাজনীতির ক্ষেত্রে তাদের আরোও দাবী ছিল যে, শাসনক্ষমতা ও সার্বভৌমত্ব কোনো রাজপরিবারের মালিকানা হতে পারবে না, আর তা জমিদার গোষ্ঠীর সম্পত্তি হবে না ; বরং তা দেশের সাধারণ জনগণেরই ইখতিয়ারভুক্ত হবে। তাদেরই প্রদত্ত কর দ্বারা সরকারের সমস্ত কাজ সম্পন্ন হয়, অতএব সরকারের ভাংগা-গড়া ও পরিবর্তন কেবলমাত্র তাদেরই রায় অনুযায়ী হতে হবে এবং আইন প্রণয়ন ও শাসন-শৃংখলার ব্যাপারেও একমাত্র তাদেরই আওয়াযের প্রভাব স্বীকৃত হবে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে দুনিয়ার বুকে যে নবতর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, উপরোল্লিখিত মতবাদ-বিশ্বাসই তার ভিত্তিস্বরূপ গৃহীত হয়েছে।

অর্থনীতির ক্ষেত্রে তারা গুরুত্ব সহকারে এ নীতিরই প্রচার করতে লাগলো যে, স্বাভাবিক অর্থনৈতিক নিয়ম-নীতিকে যদি বাহ্যিক প্রভাব প্রতিবন্ধকতা ও হস্তক্ষেপ ছাড়াই কাজ করার সুযোগ দেয়া হয়, তবে ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় স্বতস্ফূর্তভাবেই সমাজ কল্যাণের বিরাট বিরাট কাজ সম্পন্ন হতে পারে। উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে, তার বন্টনও অধিকতর উন্নত পন্থায় হতে পারবে। অবশ্য সেই জন্য লোকদের চেষ্টা ও কর্মসাধনার পূর্ণ আযাদীও এ স্বাভাবিক কর্মে সরকারের কৃত্রিম ধরনের হস্তক্ষেপ না করা আবশ্যক। নিরংকুশ অর্থব্যবস্থার এ মূলনীতিই (Free Enterprise) হচ্ছে আধুনিক

পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার বুনিয়াদী ফর্মূলা। রেনেসাঁ যুগের এ নিরংকুশ উদারতার ন্যায় শিল্পবিপ্লব যুগের অসীম উদারতায় ও সত্যতা ও সততার ভাবধারা যথেষ্ট পরিমাণে বর্তমান রয়েছে এবং এটাই শেষ পর্যন্ত বিজয় সূচিত হওয়ার কারণ হয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এ সততার সাথে স্বার্থপরতা ও চরমপন্থী মনোবৃত্তি পাশ্চাত্য মানসিকতার এ দুটি বিরাট দুর্বলতা অংগাংগীভাবে জড়িত রয়েছে এবং এটা পোপবাদ ও সামন্তবাদের যুগ থেকেই সক্রিয় রয়েছে।

স্বার্থপরতার চরম পরাকাষ্ঠা এই ছিল যে, তাদের অধিকাংশেরই অধিকার ও ইনসাফ দাবীর মূলে আন্তরিকতা ও স্বার্থহীনতার সাংঘাতিকরূপে অভাব ছিল। তারা সত্য ও ন্যায়নীতির অনুসারী হয়েছে বলেই যে তারা সঠিক নিয়ম-নীতি পেশ করতো তা নয়, বরং তার একমাত্র কারণই এই যে, এটা তাদের স্বার্থোদ্ধারেরই সহায়ক ও অনুকূল ছিল। এর প্রমাণ এই ছিল যে, তারা নিজেদের জন্য যেসব অধিকারের দাবী তুললো, তা তাদের মজুর ও নিঃস্ব জনগণের জন্য স্বীকার করতে আদৌ প্রস্তুত ছিল না।

তাদের চরমপন্থী মনোবৃত্তি তাদের শিক্ষিত পণ্ডিত ও লেখকদের কথায় কথায় প্রকটিত হয়ে ফুটে বের হতো। তারা কয়েকটি সত্য আদর্শকে গ্রহণ করলো এবং তার সীমা অস্বাভাবিকভাবে সম্প্রসারিত করে দিল। আর অন্যান্য কতগুলো সত্যনীতিকে তারা সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করলো। আর তাদের ব্যবহারিক জীবনে তাদের যে স্থান বা গুরুত্ব ছিল, সেখানে নিজেদের মনোনীত সত্যনীতিকে প্রতিষ্ঠিত করলো। অথচ এটা সর্বজনবিদিত যে, প্রত্যেকটি সত্যনীতি নিজস্ব সীমালংঘন করে গেলে আর সত্যনীতি থাকতে পারে না, তখন তা একেবারেই মিথ্যানীতি হয়ে যায় এবং তার বিপরীত ফল পরিলক্ষিত হতে শুরু করে। বস্তুত, বাধা-বন্ধনহীনতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র ও গণতন্ত্রের এসব মতের প্রভাবাধীন যে জীবনব্যবস্থা রচিত হয়েছে, তার প্রত্যেকটি দিকেই উক্তরূপ ভারসাম্যহীনতা তীব্রভাবে বর্তমান রয়েছে, কিন্তু এ আলোচনা যেহেতু কেবলমাত্র অর্থনৈতিক দিকেই সীমাবদ্ধ, সেই জন্য অন্যান্য দিক সম্পর্কে কোনোই আলোচনা করা হবে না। আমরা কেবলমাত্র এ দিকটির আলোচনা করেই দেখাতে চাই যে, স্বাভাবিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সাথে স্বার্থপরতা ও চরমপন্থীর মনোবৃত্তির সংমিশ্রণ করে কতখানি ভারসাম্যহীন অর্থব্যবস্থা এরা রচনা করেছে ও এর পরিণতি কতখানি মারাত্মক হয়েছে।

❐

আধুনিক পুঁজিবাদী অর্থনীতি

পূর্ববর্তী প্রবন্ধে সংক্ষেপে বলেছি যে, অবাধ ও উদার অর্থ লুণ্ঠননীতির উপর যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছে, তারই পারিভাষিক নাম হচ্ছে আধুনিক পুঁজিবাদ (Modern Capitalism)।

অবাধ অর্থব্যবস্থার মূলনীতি

পুঁজিবাদ ও অনিয়ন্ত্রিত অর্থব্যবস্থার মূলনীতি সাতটি, নিম্নে তা যথাক্রমে উল্লেখ করা যাচ্ছে ঃ

এক ঃ ব্যক্তিগত মালিকানার অধিকার ঃ অনিয়ন্ত্রিত পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় শুধু পোশাক, তৈজষপত্র, ফার্নিচার, বাড়িঘর, যানবাহন, গৃহপালিত পশু প্রভৃতি সাধারণ নিত্য ব্যবহার্য জিনিসগুলোর উপরই ব্যক্তি মালিকানা স্বীকৃত হয় না ; বরং যন্ত্রপাতি, অস্ত্রশস্ত্র, জমি-জায়গা, কাঁচামাল প্রভৃতি উৎপাদক জিনিসের উপরও ব্যক্তিগত মালিকানার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম প্রকারের দ্রব্যাদিতে ব্যক্তিগত মালিকানা অধিকার অবিসম্বাদিতভাবে প্রত্যেকটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই স্বীকার করে নিয়েছে, কিন্তু উৎপাদনযন্ত্র ও বাহনাদি ব্যক্তিগত মালিকানা হতে পারে না, হওয়া উচিত কিনা তা নিয়েই বিভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে বিরাট মতবৈষম্যের সৃষ্টি হয়েছে। অবশ্য পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা এ ক্ষেত্রেও ব্যক্তিগত মালিকানা পুরোপুরি স্বীকার করে নিয়েছে। শুধু তাই নয়, বরং এটাই হচ্ছে পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার বুনিয়াদ এবং এটাই হলো তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

দুই ঃ উপার্জন অধিকারের স্বাধীনতা ঃ পুঁজিবাদী সমাজের অধিবাসীগণ ব্যক্তিগতভাবে কিংবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীতে সংঘবদ্ধ হয়ে নিজেদের পুঁজি ও উপায়-উপাদানকে উৎপাদনের কাজে নিয়োগ করার পূর্ণ স্বাধীনতা পেয়ে থাকে। এর ফলে লাভ হোক আর ক্ষতি হোক তা সবকিছুই তাদের নিজেদেরই ভোগ করতে হয়, খেসারতের ঝুঁকি যেমন তাদের নিজেদেরই গ্রহণ করতে হয়, মুনাফার পাহাড় গড়তেও তেমনি কোনো বাধা-প্রতিবন্ধকতা নেই। উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি কিংবা হ্রাস করার ব্যাপারেও তারা পূর্ণ স্বাধীনতা পেয়ে থাকে। আর উৎপন্ন পণ্যের মূল্য নির্ধারণও একমাত্র তাদেরই ইচ্ছাধীন। লোকদের নির্দিষ্ট মজুরী কিংবা বেতনের বিনিময়ে কর্মে নিয়োগ করা, নিজেদের ব্যবসায়ে যে কোনো শর্ত বা দায়িত্ব গ্রহণ করা এবং সেই জন্য নিয়ম-কানুন রচনা করার ব্যাপারে তাদের পূর্ণ আযাদী রয়েছে। মোটকথা

ক্রেতা ও বিক্রেতা, মজুর ও মালিক, মনিব ও চাকরের পারস্পরিক যাবতীয় ব্যাপার পূর্ণ স্বাধীনতার সাথে সম্পন্ন হতে হবে এবং যে কোনো শর্তেই পারস্পরিক সমঝোতা হয়ে যায় তাই কার্যকরী করার পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা আবশ্যক।

তিন ঃ ব্যক্তিগত মুনাফাই কর্মপ্রেরণার উৎস ঃ পুঁজিবাদী অর্থনীতি প্রয়োজনীয় পণ্য উৎপাদন উন্নয়নের ব্যাপারে ব্যক্তিগত স্বার্থের লোভ ও লুণ্ঠন-লালসার উপরই একান্তভাবে নির্ভর করে থাকে। এ স্বার্থলোভ ও মুনাফার লালসা স্বভাবতই প্রত্যেক মানুষের মধ্যে বর্তমান রয়েছে এবং এটাই মানুষকে কর্মের প্রেরণা দেয় ও উৎপাদনী শ্রমে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্বুদ্ধ করে। পুঁজিবাদ সমর্থক লোকদের মতে এতদপেক্ষা উত্তম—বরং এছাড়া অন্য কোনো জিনিসই—মানুষের মধ্যে কর্মের প্রেরণা ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে পারে না। মুনাফার পরিমাণ কম করে দিলে লোকদের উপার্জন স্পৃহা, শ্রম ও চেষ্টা-মেহনতের মাত্রা অনেকখানি হ্রাস পেয়ে যাবে। কিন্তু মুনাফার দুয়ার যদি অবাধ ও উন্মুক্ত থাকে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি যদি নিজ শ্রম-মেহনত ও যোগ্যতা অনুসারে সম্ভাব্য পরিমাণ উপার্জন করার পূর্ণ সুযোগ পায়, তবে প্রত্যেক ব্যক্তিই সর্বোচ্চ পরিমাণে ও উৎকৃষ্ট মানের কাজ করতে চেষ্টা করবে। এর ফলে উৎপাদনের পরিমাণ স্বতই বৃদ্ধি পাবে, তার মানও ক্রমশ উন্নত হতে থাকবে। সম্ভাব্য সকল প্রকার উপায়-উপাদান সর্বোচ্চ পরিমাণে ব্যবহৃত হতে শুরু করবে, প্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ ক্ষেত্র বিশালতর হবে। এভাবে ব্যক্তিগত মুনাফার লালসা সামগ্রিক স্বার্থের অনুকূলে এমন এক অপূর্ব খেদমত সম্পাদন করে দিবে যা অন্য কোনো উপায়ে সম্পাদিত হওয়ার কোনোই সম্ভাবনা নেই।

চার ঃ প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঃ পুঁজিবাদী অর্থনীতির সমর্থকগণ পুঁজিবাদ ও অবাধ শোষণের ওকালতি করতে গিয়ে বলে যে, এ ধরনের অর্থব্যবস্থার প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাই হলো ব্যক্তিদের চরম এবং তাদের মধ্যে সামঞ্জস্য ও ভারসাম্য রক্ষা করার একমাত্র ব্যবস্থা। আর এ ব্যবস্থাও প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক। খোলা বাজারে একই পণ্যের বহুসংখ্যক উৎপাদক, বহু ব্যবসায়ী ও ক্রেতা হলে প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার চাপে দ্রব্যমূল্যের সামঞ্জস্য ও ভারসাম্য স্থাপিত হতে থাকে। এর দরুন মুনাফাখোরী স্থায়ীভাবে সীমালংঘন করতে পারে না। মুনাফার হার একেবারে হ্রাস পেতেও পারে না, অবশ্য আকস্মিকভাবে দ্রব্যমূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধি ও উত্থান-পতনের কথা স্বতন্ত্র। অনুরূপভাবে শ্রমিক ও মালিক উভয়ই নিজ নিজ স্থানে বসে প্রতিযোগিতা এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে মজুরীর পারস্পরিক

গ্রহণযোগ্য হার নির্ধারণ করে নিতে থাকে। তবে এ প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রকাশ্য ও সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে হতে হবে এবং কোনো প্রকার মনোপলি (একচেটিয়া অধিকার) দ্বারা একে সংকীর্ণ করা চলবে না।

পাঁচ ঃ মালিক ও মজুরের অধিকারের পার্থক্য ঃ পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় প্রত্যেকটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীগণ দুই পক্ষে বিভক্ত হয়ে থাকে। প্রথম পক্ষে থাকে প্রতিষ্ঠানের মালিকগণ। তারা নিজেদেরই দায়িত্বে ব্যবসায় কিংবা শিল্পকার্যের সূচনা করে, পরিচালনা করে এবং শেষ পর্যন্ত তার লাভ লোকসানের জন্য দায়ী হয়। দ্বিতীয় পক্ষে থাকে মজুর-শ্রমিক ও বেতনভোগী কর্মচারীগণ। মূল প্রতিষ্ঠানের লাভ লোকসানের সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক থাকে না। তারা শুধু নিজেদের সময়, শ্রম ও যোগ্যতা-কর্মদক্ষতাকে এ ব্যবসায়ে নিয়োগ করে। ব্যবসায়ে অনেক সময়ই লোকসান হয়ে থাকে। কিন্তু মজুর-শ্রমিকরা শুধু নিজ মজুরী নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে। অনেক সময় আবার গোটা কারবারই বরবাদ হয়ে যায় ; ফলে মালিকপক্ষ একেবারেই স্বর্বস্বান্ত হয়ে যায়। কিন্তু এর কোনো আঘাতই মজুরদের পর্যন্ত পৌঁছায় না। তাদের ক্ষেত্রে শুধু এতটুকু পার্থক্য হয়ে থাকে যে, তারা আজ যেখানে মজুরী করছে, তার বরবাদ হয়ে যাওয়ার পর সেখান থেকে অন্যত্র চাকুরী খোঁজ করতে বাধ্য হয় মাত্র।

পুঁজিবাদী সমর্থকগণ বলে যে, অবস্থার এ পরিপ্রেক্ষিতেই প্রমাণ হয় যে, লোকসানের বোঝা যার মাথায় চাপে, কারবারের ঝুঁকি যাকে পোহাতে হয়, ইনসাফের দৃষ্টিতে মুনাফার অংশ তারই ভাগে পড়া উচিত। মজুর-শ্রমিকরা নিজেদের উপযুক্ত মজুরী পাবার অধিকারী মাত্র এবং সে মজুরীও তাই হবে, যা তাদের কাজের ধরন, স্বরূপ ও পরিমাণের দৃষ্টিতে বাজারের হার অনুযায়ী ন্যায়সঙ্গত বলে বিবেচিত হবে। কারবারে মুনাফা হলে মুনাফা হওয়ার দোহাই দিয়ে এ মজুরীর পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার কোনোই কারণ নেই, পক্ষান্তরে কারবারে লোকসান হলেও তার যুক্তি দেখিয়ে মজুরী হ্রাস করারও কোনো কথা হতে পারে না। শুধু নির্দিষ্ট হারে মজুরী গ্রহণ করে কাজ করাই হচ্ছে মজুরের দায়িত্ব, এটাই তাকে মজুরী পাওয়ার অধিকারী বানায়। এ ব্যাপারে কোনোরূপ হ্রাস-বৃদ্ধি হলে তা অন্যান্য দ্রব্যাদির মূল্য হ্রাস-বৃদ্ধির স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী হবে। কাজ গ্রহণকারী লোকদের সংখ্যা হ্রাস এবং কর্মপ্রার্থীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে মজুরী স্বতস্ফূর্তভাবে হ্রাস পাবে আর এর বিপরীত হলে মজুরীর পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। অনুরূপভাবে দক্ষ ও বিচক্ষণ কর্মীর কাজ স্বভাবতই অধিক মজুরী অর্জন করবে। কারবারের মালিকপক্ষ নিজেদেরই স্বার্থ ও মুনাফার খাতিরে পুরস্কার ও পদোন্নতি দান করে তাকে

সন্তুষ্ট করতে থাকবে। কর্মী স্বয়ং যে পরিমাণ মজুরী পাবে, কারবারের উন্নতি ও যথার্থতা বিধানের জন্য সে ততখানি প্রাণপণ শ্রম করবে। মালিক পক্ষ স্বভাবত কম খরচে অধিক মুনাফা পাবার কথা চিন্তা করবে, এজন্য মজুরী যথাসম্ভব কম দিবার জন্যই তার চেষ্টা হবে ; পক্ষান্তরে মেহনতী জনতা নিজেদের প্রয়োজন সম্ভাব্যভাবে অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্য ও সচ্ছলতা সহকারে পূরণ করার জন্য ও তাদের জীবনযাত্রার মান কিছু না কিছু উন্নয়নের জন্য স্বাভাবিকভাবেই চেষ্টা করবে। এ কারণে মজুরী বাড়াবার জন্য তাদের আন্তরিক প্রচেষ্টা হওয়া স্বাভাবিক। এরূপ বিরোধ থেকে স্বভাবতই একটি দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হবে, কিন্তু তা সত্ত্বেও দুনিয়ার অন্যান্য নানাবিধ কাজের ন্যায় এ ব্যাপারটিও বহু হ্রাস, বৃদ্ধি ও উত্থান পতনের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হবে এবং উভয় পক্ষেরই গ্রহণযোগ্য কোনো হার অনুযায়ী মজুরী নির্ধারিত হতে থাকবে।

ছয় ঃ ক্রমবিকাশের স্বাভাবিক কার্যকরণের উপর নির্ভরশীলতা ঃ পুঁজিবাদ সমর্থকরা বলে থাকে যে, কম খরচায় অধিক উৎপাদনের উপরই যখন ব্যবসায়ে মুনাফা লাভের সমস্ত কিছু নির্ভর করে, তখন ব্যবসায়ীকে তার স্বার্থেই সম্ভাব্য পরিমাণে অধিক বৈজ্ঞানিক পন্থা গ্রহণ করতে মেশিন ও যন্ত্রপাতিগুলোকে অধিক উত্তম অবস্থায় রক্ষণাবেক্ষণ করতে বিপুল পরিমাণ কাঁচামাল কম মূল্যে অর্জন করতে ও নিজের ব্যবসায়ের যাবতীয় পন্থা ও সংগঠনকে অধিকতর উন্নত করতে সচেষ্ট থাকতে হয়। অবাধ ও নিরঙ্কুশ অর্থব্যবস্থায় এ কাজ কোনো প্রকার বহিঃপ্রভাব ও কৃত্রিম ব্যবস্থাপনা ছাড়া আভ্যন্তরীণ সংস্থা আপনা হতেই সম্পন্ন করে থাকে। বিপুল সংখ্যক বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত ব্যক্তি ও দলের ব্যক্তিগত চেষ্টা-সাধনার দ্বারা প্রাকৃতিক আইন, সমাজ-সমষ্টির উন্নতি ও স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের এমন সব কাজ সম্পন্ন করে থাকে, যা কোনো সামগ্রিক পরিকল্পনার সাহায্যেও এতো সুসংবদ্ধভাবে সম্পন্ন হতে পারে না। বস্তুত এটা প্রকৃতিরই পরিকল্পনা বিশেষ, যা অননুভূতভাবে কার্যকরী হয়ে থাকে।

সাত ঃ রাষ্ট্র-সরকারের নিষ্ক্রিয়তা ঃ পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার সমর্থকদের বক্তব্য এই যে, ব্যক্তিগণ কোনো প্রকার বাধা-প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই পূর্ণ স্বাধীনতা সহকারে কাজ করার সুযোগ পেলে উপরোল্লিখিত মূলনীতি অনুযায়ী সমাজের কল্যাণ সাধন ও উন্নতি বিধানের প্রকৃতিই এমন সামঞ্জস্য স্থাপন করেছে যে, লোকেরা একই সাথে মিলিত হয়ে কাজ করতে থাকলে পরিণামে সকলেরই কল্যাণ সাধিত হয়, যদিও বাস্তব ক্ষেত্রে তারা প্রত্যেকেই নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য কাজ করতে থাকে। উপরে যেমন বলা হয়েছে,

ব্যক্তিগণ যখন নিজস্ব চেষ্টা-সাধনায় প্রতিফল স্বরূপ অপরিসীম মুনাফা করতে পারবে তখন তারা বিপুল ও অত্যধিক পরিমাণ অর্থোৎপাদনের জন্য সর্বাত্মকভাবে নিজেদের সমস্ত শক্তি-সামর্থ ও যোগ্যতা ব্যয় করতে থাকে। এর ফলে অনিবার্যভাবেই সকলের জন্যই অধিক উৎকৃষ্ট পণ্য বিপুল পরিমাণে উৎপন্ন হতে থাকবে। ব্যবসায়ী, শিল্পপতি ও কাঁচামাল সরবরাহকারীদের মধ্যে প্রকাশ্য বাজারে প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হলে দ্রব্যমূল্যে স্বাভাবিক সামঞ্জস্য স্থাপিত হয়ে থাকে, পণ্যের মান স্বতঃই উন্নত হতে থাকে এবং সমাজের নিকট কোন্ পণ্যটি কত পরিমাণ প্রয়োজন তা আপনা হতেই জানতে পারা যায়। এ সমস্ত ব্যাপারে ধন উৎপাদনে স্বাভাবিক কর্মধারায় অযথা হস্তক্ষেপ করে এ স্বাভাবিক ভারসাম্য চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়া রাষ্ট্র-সরকারের কিছুতেই উচিত হতে পারে না। বরং ব্যক্তিগত কর্মস্বাধীনতা সংরক্ষণের সর্বাধিক অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করাই তার দায়িত্ব। সারা দেশে শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা তার কর্তব্য। নাগরিকদের ব্যক্তিগত মালিকানার সংরক্ষণ তাকেই করতে হবে। পারস্পরিক চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার জন্য তাকে আইন ও শাসন প্রয়োগ করতে হবে। বহিরাক্রমণ, বিরুদ্ধতা ও সকল বিপদ হতে দেশ ও দেশের ব্যবসায়-বাণিজ্য ও ধন-সম্পদ রক্ষা করাই হচ্ছে রাষ্ট্রের দায়িত্ব। সুবিচারক, সংরক্ষক ও নিয়ন্ত্রণকারী হওয়ার দায়িত্ব পালনই হচ্ছে রাষ্ট্রের কর্তব্য। তার নিজেরই ব্যবসায়ী, শিল্পপতি ও ভূস্বামী হয়ে বসা কিংবা বারবার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে ব্যবসায়ী, শিল্পপতি ও জমিদারের কাজ ব্যাহত করা কখনোও বাঞ্ছনীয় হতে পারে না।

বিপর্যয়ের কারণ

আধুনিক পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার জন্মকাল থেকেই উল্লেখিত মূলনীতিসমূহ বিশ্ব সমক্ষে পেশ করা হয়েছে। আর তাতে বাড়াবাড়ি থাকা সত্ত্বেও বাস্তবতার দৃষ্টিতে যথেষ্ট সত্যতা নিহিত রয়েছে বলে সারা দুনিয়ায় তা সাধারণত সমর্থিত হয়েছে। বস্তুত তাতে নূতন কথা কিছুই নেই। অজ্ঞাত কাল থেকেই মানবীয় অর্থনীতির কাজ-কারবার এসব নীতিমালার ভিত্তিতেই সম্পাদিত হয়ে এসেছে। শিল্প বিপ্লবকালীন অর্থনীতিতে কোনো কোনো নীতি প্রয়োগের ব্যাপারে বুর্জোয়া শ্রেণী যে অতিরিক্ত বাড়াবাড়িমূলক কঠোরতা অবলম্বন করেছিল, এ ক্ষেত্রে একমাত্র তাই ছিল নূতনত্ব। উপরোক্ত বুর্জোয়া অর্থনীতি উপরোল্লিখিত স্বাভাবিক মূলনীতির ভিত্তিতে গড়ে উঠেনি, বরং তার সাথে যথেষ্ট ভুল নীতি সংযোগ করা হয়েছে। এছাড়া স্বাভাবিক অর্থব্যবস্থার জন্য অপরিহার্য কতগুলো জরুরী ভুল নীতিকেও তারা পরিত্যাগ করেছিল। প্রকৃতপক্ষে তা স্বাধীন ও নিরঙ্কুশ অর্থনীতির উপরোল্লিখিত মূলনীতির মতোই

সমান গুরুত্বপূর্ণ। তারা নিজেদেরই উপস্থাপিত অনেকগুলো মূলনীতিকে নিতান্ত স্বার্থপরতার বশবর্তী হয়ে অস্বীকার করেছে। এ চারটি জিনিসের সমন্বয়ে পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় উদ্ভূত সমস্ত বিপর্যয়ের সৃষ্টি হওয়া সম্ভব হয়েছে এবং এটা এতদূর সাংঘাতিক রূপ ধারণ করেছে যে, সমগ্র দুনিয়া তার বিরুদ্ধে চিৎকার করে উঠেছে।

পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার দোষ-ত্রুটিসমূহের এক সংক্ষিপ্ত যাচাই ও পর্যালোচনা এখানে পেশ করা যাচ্ছে ঃ

এক ঃ অবাধ ও নিরঙ্কুশ অর্থব্যবস্থার সমর্থনে লোকেরা যেসব স্বাভাবিক নিয়ম-কানুনের বার বার দোহাই দিয়ে থাকে তা তাদের উক্তি ও ব্যবহার পদ্ধতি অনুপাতে মোটেই সত্য নয়। লর্ড কিনস্ সত্যই বলেছেন যে, দুনিয়ায় নৈতিক ও স্বাভাবিক নিয়ম-কানুনের এমন কোনো মজবুত শাসন বর্তমান নেই, যার দরুন স্বতস্ফূর্তভাবেই ব্যক্তি স্বার্থ ও সমাজ স্বার্থের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপিত হতে থাকবে। অত্যাধুনিক স্বার্থপরতা সবসময় সামাজিক কল্যাণের জন্য চেষ্টা করে বলে অর্থশাস্ত্রের মূলনীতি হতে এমন কথা আবিষ্কার করা কিছুমাত্র ঠিক নয়। আর স্বার্থপরতা সবসময়ই উদার হয়ে থাকে একথা বলাও ঠিক হতে পারে না। কেননা অনেক সময় দেখা যায়, ব্যক্তি স্বার্থ উদ্ধারের জন্য চেষ্টানুবর্তী লোক এতোদূর অজ্ঞ ও দুর্বল হয়ে থাকে যে, তার দ্বারা স্থায়ীভাবে কোনো সামগ্রিক ও জাতীয় স্বার্থ উদ্ধার হওয়াতো দূরের কথা, নিজের স্বার্থটুকু আদায় করতেও সে ব্যর্থ হয়ে যায়।

বস্তুত, অতিরিক্ত বাড়াবাড়িমূলক কথাগুলো যুক্তির দিক দিয়েই নির্ভুল ছিল না, শুধু তাই নয়, বরং বুর্জোয়া পুঁজিপতিগণ নিজেদের কাজের দ্বারাই প্রমাণ করেছে যে, তাদের স্বার্থপরতা কিছুমাত্র উদারতামূলক ছিল না। তারা সাধারণ খরিদ্দার, শ্রমজীবি ও শান্তি-নিরাপত্তা স্থাপক সরকার—এক সাথে এ তিনটির বিরুদ্ধে ঐক্যজোট গড়ে তুলেছে এবং শিল্পবিপ্লবের আসল ফায়দাটুকু সম্পূর্ণরূপে লুটে নেবার জন্য সম্মিলিতভাবে ষড়যন্ত্র করেছে। তাদের পারস্পরিক যোগসাজশই অবাধ নিরঙ্কুশ অর্থনীতির সমর্থনে তাদের উপস্থাপিত সর্বাপেক্ষা বড় যুক্তিটিকেই চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছে। অর্থাৎ প্রমাণ হয়েছে যে, স্বাভাবিক ভাঙ্গা গড়া দ্বারা সকলের মধ্যে মুনাফার ভারসাম্য স্বতঃই স্থাপিত হয় বলে যে দাবী করা হয়ে থাকে তা সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা। এ কারণে অবাধ, নিরঙ্কুশ অর্থব্যবস্থার সর্বাপেক্ষা বড় সমর্থক অ্যাডাম স্মীথ শেষ পর্যন্ত বলতে বাধ্য হয়েছেন যে ঃ

"ব্যবসায়ী লোকদের কোথাও একত্রিত হওয়া ও তাদের এ বৈঠকে জনগণের বিরুদ্ধে কোনো ষড়যন্ত্র ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির অনুকূলে কোনো প্রস্তাব পাস না করেই সমাপ্ত হওয়া অত্যন্ত বিরল ঘটনা। এমনকি বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে মিলিত হয়ে বসার সুযোগকেও এরা এ অপরাধমূলক কাজে না লাগিয়ে ছাড়ে না।"

অনুরূপভাবে ব্যক্তিগত মালিকানা ও স্বাধীন চেষ্টা-শ্রমের সুযোগে জনগণ এমন কতগুলো অধিকার লাভ করে থাকে, যা কোনো ক্রমেই নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত নয়—পুঁজিবাদ সমর্থকদের এ দাবীও অত্যন্ত বাড়াবাড়ি ও অত্যন্ত আতিশয্যপূর্ণ। এক ব্যক্তি যদি নিজের মালিকানার ক্ষেত্রে এমনসব কর্মতৎপরতা গ্রহণ করে যার দ্বারা হাজারো মানুষের জীবন-জীবিকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে অথবা এক ব্যক্তি যদি নিজের ব্যক্তি স্বার্থ উদ্ধারের জন্য চেষ্টা ও কর্মের এমন পন্থা অবলম্বন করে যাতে সমগ্র সমাজের স্বাস্থ্য, চরিত্র, নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়ে পড়ে, তবে তাকে এ ধরনের কাজের জন্য অবাধ নিরঙ্কুশ সুযোগ করে দেয়ার এবং তাকে ব্যক্তিগত অধিকার দ্বারা সমাজস্বার্থ ক্ষুণ্ন করা থেকে বিরত রাখার জন্য আইনের প্রয়োগ না করার পশ্চাতে কি যৌক্তিকতা থাকতে পারে ? সরকারের নিরপেক্ষতার কথাটিকেও তারা তার সংগত সীমা থেকে এতদূর বাড়িয়ে দিয়েছে যে, তার খারাপ প্রতিক্রিয়া না হয়ে পারে না। শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ যদি ঐক্যজোটের মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক লোককে শোষণ করতে শুরু করে এবং সরকার তখন নীরব দর্শক হয়ে তামাশা দেখতে থাকে কিংবা সেই শক্তিমানদেরই স্বার্থ সংরক্ষণ করতে শুরু করে, তবে তার অনিবার্য ফলস্বরূপ তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়া একেবারেই স্বাভাবিক। আর এ ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখা দিলে তা সবসময়ই যে সঙ্গত নিয়মতান্ত্রিক পন্থার অনুসারী হবে এমন কোনো কথা নেই।

দুই ঃ বিশেষত শিল্পবিপ্লবের যুগে অবাধ নিরঙ্কুশ ব্যবস্থার মূলনীতি-সমূহের এতদূর আতিশয্য ও বাড়াবাড়ি অত্যন্ত ভুল ছিল সন্দেহ নেই। শিল্পবিপ্লবের কারণে উৎপাদন পদ্ধতিতে মৌলিক পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল। পূর্বে যেখানে মানবীয় ও পশুশক্তি ব্যবহার হতো ; শিল্পবিপ্লবের যুগে সেখানে যন্ত্র ব্যবহৃত হতে লাগলো। একটি 'মেশিন' স্থাপিত হওয়ার ফলে দশ ব্যক্তি সহস্র ব্যক্তির কাজ সম্পন্ন করতে লাগলো। এ ধরনের উৎপাদন পদ্ধতি স্বভাবতই মুষ্টিমেয় লোকদের কর্মসংস্থান করে ও হাজার মানুষকে করে বেকার সমস্যার সম্মুখীন। এ ধরনের উৎপাদন পদ্ধতির ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মালিকানা ও স্বাধীন-অবাধ চেষ্টা সংগ্রামের অধিকার এবং সরকারের নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বনের দাবী নীতিগতভাবেও অন্যায়। এক ব্যক্তি কিংবা একটি দল

নিজস্ব উপায় উপাদানের জোরে হঠাৎ এক বিরাট কারখানা খুলে বসে ; কিন্তু এর দরুন ব্যক্তি পর্যায়ে ও ক্ষুদ্র আকারের উৎপাদক হাজার হাজার কর্মজীবির জীবনে যে কি রকম বিপর্যয় ডেকে এনেছে সে তার বিন্দুমাত্র পরোয়া করে না, এটা কিরূপে সঙ্গত হতে পারে ? অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, শিল্পোৎপাদনে যন্ত্রশক্তি ব্যবহারের যৌক্তিকতাকে এখানে অস্বীকার করা হয়েছে। আসল বক্তব্য এই যে, নিতান্ত অন্ধভাবে ও সম্পূর্ণ নির্বিচারে যন্ত্রশক্তির ব্যবহার হওয়া মোটেই উচিত ছিল না এবং এ শিল্পশক্তি যেসব লোককে বেকার করে দিচ্ছে সাথে সাথে তাদের কর্মসংস্থানের জন্য প্রথম দিন থেকেই চিন্তা ও ব্যবস্থা করা সরকারের কর্তব্য ছিল; কিন্তু এরূপ কোনো ব্যবস্থা না হওয়ার দরুন যান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতি সক্রিয় হওয়ার সাথে সাথেই মানব সমাজে এমন একটি বিরাট ও স্থায়ী সমস্যা হিসাবে বেকার সমস্যা দেখা দিল যে, পূর্বের ইতিহাস এ ধরনের অবস্থার সাথে কিছুমাত্র পরিচিত ছিল না। একথা সর্বজন বিদিত যে, বেকারত্ব কোনো একটি বিশেষ জিনিসের নাম নয়, বরং তা হচ্ছে মানুষের জৈবিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও তামাদ্দুনিক জীবনের অসংখ্য প্রকার জটিল সমস্যার আদি পিতা। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, এক ব্যক্তি কিংবা মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোক নিজস্ব মালিকানার ক্ষেত্রে এমন কর্মতৎপরতা গ্রহণের কি অধিকার পেতে পারে, যার দরুন সমাজ জীবনে এতবড় মারাত্মক জটিলতার সৃষ্টি হয় এবং কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি এ ধরনের পদক্ষেপকে সামগ্রিক স্বার্থ সংরক্ষণকারী এবং ব্যক্তিগত পর্যায়ে উদার ও নির্দোষ স্বার্থপরতা বলে অভিহিত করার সাহস করতে পারে ? উপরোক্ত এ ধরনের ব্যক্তিগত স্বেচ্ছাচারিতাকে অবাধ ও প্রকাশ্য সুযোগ দান করে জাতীয় সরকারের নীরব নিষ্ক্রীয় হয়ে থাকা এবং মুষ্টিমেয় লোকদের কর্মতৎপরতার ফলে গোটা জাতির জীবনে যে কি সাংঘাতিক বিপর্যয় নেমে আসতে পারে, তা একটুও চিন্তা না করা যে কতখানি মারাত্মক নির্বুদ্ধিতা তা বলে শেষ করা যায় না।

তিন ঃ এভাবে যান্ত্রিক ও উৎপাদন যখন লক্ষ লক্ষ মানুষকে বেকার করে দিল এবং তারা নিজেদের গ্রাম, পল্লী, মহল্লা ও বস্তি থেকে নির্গত হয়ে বড় বড় কারখানা মালিক ও ব্যবসায়ীর নিকট চাকুরী ও মজুরী করার সুযোগ সন্ধানে ধর্ণা দিতে লাগলো, তখন এ মৃত্যু-পথযাত্রী লোকেরা রুযী-রুটির জন্য পুঁজিবাদীদের নির্দিষ্ট নিম্নতম হারে মজুরী পেয়ে দিনরাত হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করতে বাধ্য হলো। কিন্তু তবুও সমস্ত বেকার লোকেরা কাজ পেলো না, তখনো একটি বিরাট অংশ স্থায়ীভাবে বেকার হয়ে রইলো, আর যারা কাজ পেল তাদেরও পুঁজিবাদীদের সাথে দরকষাকষি করে কোনো ভাল শর্তে চুক্তিবদ্ধ

হবারও কোনো সামর্থ ছিল না। কেননা তারা নিজেরাই অসহায় অবস্থায় রুযীর সন্ধানে বের হয়েছিল। পুঁজিবাদীদের মর্জী মাফিক শর্ত না মেনে নিলে রাতের বেলার রুটির কোনো ব্যবস্থাই ছিল না। তা সত্ত্বেও কিছু দর কষাকষি করলে এ সুযোগটিও কেড়ে নেবার জন্য অন্যান্য হাজার ক্ষুধাক্লিষ্ট শ্রমজীবি উন্মুখ হয়ে বসেছিল। অবাধ প্রতিযোগিতার পরিবেশে শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে উপযুক্ত সুবিচারপূর্ণ মজুরী ভাঙ্গাগড়ার মাধ্যমে আপনিই নির্দিষ্ট হয়ে যায় বলে পুঁজিবাদ সমর্থকগণ যে যুক্তি পেশ করে থাকে, তার অন্তঃসারশূন্যতা এভাবেই জনসমক্ষে প্রমাণিত হয়ে পড়ে। কেননা এখানে প্রকৃতপক্ষে প্রতিযোগিতার যে সুযোগ রয়েছে, তা মোটেই অবাধ ও উন্মুক্ত নয়। এখানে এক ব্যক্তি হাজার হাজার মানুষের রুটি-রুযীর যাবতীয় উপায়-উপাদান পূর্বাহ্নেই নিরঙ্কুশভাবে দখল করে বসে আছে। আর হাজার হাজার শ্রমজীবি যখন অনশনক্লীষ্ট হয়ে ছটফট করতে করতে তার দরবারে এসে পৌঁছলো, তখন সে তাদের সকলকে নয়—মাত্র দশমাংশ কিংবা তার দ্বিগুণ কর্মপ্রার্থীকে চাকুরী দান করলো। এরূপ অবস্থায় মজুরী নির্ধারণের সমস্ত ক্ষমতা এক পক্ষেরই কুক্ষিগত হয়ে থাকে এবং হাজার হাজার কর্মপ্রার্থীর মধ্যে কেউই নিজের ইচ্ছানুরূপ শর্তে মালিক পক্ষকে রাজী করাবার সামর্থ রাখে না। এ কারণে এ শিল্পবিপ্লবের যুগে আধুনিক পুঁজিবাদের প্রসার লাভ করার সাথে সাথে সমাজে বেকার সমস্যা ছাড়াও দারিদ্র ও অভাব-অনটনের মুসিবত সাংঘাতিক রূপ ধারণ করে চলেছে। বড় বড় শিল্প ও ব্যবসায় কেন্দ্রে মজুরী ও চাকুরী লাভের জন্য যারা সমবেত হয়েছে, তাদেরকে অতি নগণ্য পরিমাণ মজুরীর বিনিময়ে অত্যধিক শ্রম ও সময় দানে বাধ্য হতে হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তারা নিতান্ত জন্তু-জানোয়ারের ন্যায় শ্রম করতে শুরু করলো। শহরের সংকীর্ণ ও অন্ধকারাচ্ছন্ন পায়রার খোপের ন্যায় বাড়ী-ঘরে বসবাস করতে লাগলো, ফলে তাদের স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়তে শুরু করলো। সাথে সাথে তাদের মনোভাব-মনোবৃত্তি অবর্ণনীয়ভাবে নীচ হয়ে পড়তে লাগলো। চারদিকে এক আত্মকেন্দ্রিক ও চরম স্বার্থপরতার পঙ্কিল পরিবেশ গড়ে উঠলো। পিতা ও পুত্রের মধ্যেও শ্রদ্ধা-স্নেহ ও সহানুভূতির কোনো অস্তিত্বই বাকী রইলো না। পিতামাতার পক্ষে সন্তান এবং স্বামীদের পক্ষে স্ত্রীগণ এক দুর্বহ বোঝাস্বরূপ হয়ে বসলো। মোটকথা এ ভ্রান্ত এ একদেশদর্শী অবাধ-নিরঙ্কুশ অর্থব্যবস্থার বিষক্রিয়া জীবনের প্রত্যেকটি বিভাগকেই মারাত্মক রূপে জর্জরিত ও বিপর্যস্ত করে তুলেছে।

চার ঃ তার উপর মজার ব্যাপার এই যে, অসীম উদারতা ও গণতন্ত্রের এ দাবীদারগণ যারা ভূমি মালিকদের বিরুদ্ধে লড়াই-ঝগড়া করে নিজেদের

ভোটাধিকার স্বীকৃত করে নিয়েছিল, যারা লক্ষ কোটি মানুষের রুটি-রুযীর একছত্র মালিক ও মোখতার হয়ে বসেছিল, তারা সেই লক্ষ কোটি জনগণের সামান্য ভোটাধিকার পর্যন্ত দিতে প্রস্তুত হয়নি। তারা একই পেশার ব্যবসায় মালিকদের নিজস্ব সমিতি গঠন করার, দ্রব্যমূল্য, কর্মচারীদের বেতন ও শ্রমিকদের মজুরী নির্ধারণ করার অধিকার পুরোপুরি ভোগ করে থাকে ; কিন্তু চাকুরীজীবি ও মজুরদেরকে সংঘবদ্ধ হবার এবং সম্মিলিতভাবে মজুরী ও বেতনের হার নির্ধারণের জন্য প্রচেষ্টা চালাবার অধিকার মোটেই দিতে প্রস্তুত নয়। এমনকি নিজেদের ইচ্ছামত কারখানা বন্ধ করে, হাজার হাজার কর্মচারী ও মজুর শ্রমজীবিদেরকে একই সময় বেকার সমস্যার সম্মুখিন করে দেয়া এবং এভাবে অনশনক্লিষ্ট করে কম মজুরীর বিনিময়ে কাজ করতে বাধ্য করার জন্য তারা নিজেদের পূর্ণ অধিকারের পৌনপুণিকতা সহকারে দাবী জানাতে ছিল, কিন্তু চাকর-নকর ও মজুর-শ্রমিকেরা ধর্মঘটের মাধ্যমে নিজেদের মজুরী বাড়াবার জন্য চেষ্টা করতে পারে—এ অধিকারটুকু তারা দিতে একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। তাদের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে কাজ করতে করতে কোনো শ্রমিক বৃদ্ধ, রুগ্ন কিংবা অকর্মণ্য হয়ে গেলে, কর্তৃপক্ষ অবিলম্বে তাকে বিদায় করে দেয়ার পূর্ণ অধিকার ভোগ করতে চায়, কিন্তু বিদায়ী শ্রমিকের এ কাতর ফরিয়াদের কোনো জবাবই তাদের নিকট নেই যে, "আপনাদেরই কারবারের উন্নতির জন্য স্বাস্থ্য, শক্তি ও যৌবন ব্যয় করেছি, এখন অসহায় অবস্থায় আমি কোথায় যাবো, উদরজ্বালা কিরূপে নিবৃত্ত করবো।" ব্যক্তিগত স্বার্থ লাভকে যে বুর্জোয়া শ্রেণী কর্মানুপ্রেরণার একমাত্র উৎস বলে থাকে উপরোক্ত পরিস্থিতিতে তাদের নিজেদের বারংবার পেশ করা এ যুক্তিকেও তারা একেবারে ভুলে যায়। যদিও নিজেদের সম্পর্কে একথা তারা এক মুহূর্তের জন্যও ভুলতে পারে না যে, মুনাফা লাভের অসীম সুযোগ থাকলেই তাদের কাজের অদম্য উৎসাহ হবে এবং এভাবেই সামগ্রিক তরক্কী ও স্বাচ্ছন্দ লাভ সম্ভব হবে। কিন্তু চাকর ও মজুরদের ব্যাপারে তারা বেমালুম ভুলে গেল যে তাদের মুনাফা লাভ কেবল সীমাবদ্ধই নয় একেবারে সংকীর্ণ, আর যাদের বর্তমান বিপর্যস্ত এবং ভবিষ্যত অন্ধকারাচ্ছন্ন, তারা প্রাণ দিয়ে কাজ করবে কোন্ কারণে ?

পাঁচ ঃ এছাড়া বুর্জোয়া পুঁজিপতিরা ব্যবসায়ের স্বাভাবিক ও সমুচিত পন্থা পরিত্যাগ করে ব্যক্তিস্বার্থ উদ্ধারের জন্য এমনসব পন্থা গ্রহণ করলো, যা সমাজ-স্বার্থের সম্পূর্ণ পরিপন্থী, যার ফলে কৃত্রিমভাবে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেয়ে থাকে এবং যার কারণে ধনোৎপাদন ছাড়া উন্নতি অগ্রগতি মন্থর হয়ে আসে। এখানে দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি দিকের উল্লেখ করা যাচ্ছে ঃ

এ ব্যাপারে এ পন্থা অবলম্বন করা হয় যে, মূলধনের শক্তিতে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি খরিদ করে গুদামজাত করে রাখা হয়, যেমন প্রয়োজনের তুলনায় সরবরাহ কম হওয়ার ফলে ও চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়।

এ পন্থাও কার্যকরী রয়েছে যে, পণ্যের আসল উৎপাদক ও আসল ক্রেতাদের মধ্যে বসে অসংখ্য মানুষ শুধু ব্যাংকের টাকা ও টেলিফোন ব্যবহার করে অদৃশ্য উপায়ে দ্রব্য ক্রয় ও বিক্রয় করতে থাকে, দ্রব্যমূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি পেয়ে যায়, অথচ মধ্যবর্তী লোকেরা পণ্য উৎপাদনে, আমদানী রফতানী করা কিংবা তাকে ব্যবহারোপযোগী করে তোলার ব্যাপারে তাদের কোনোই যোগাযোগ থাকে না। কাজেই এটা থেকে মুনাফা লুটারও তাদের কোনো বৈধ অধিকার থাকতে পারে না। এমনকি উৎপন্ন পণ্য শুধু পরিমাণে বেশী হওয়ার কারণে মূল্য হ্রাস পাওয়ার ভয়ে অগ্নিসংযোগে জ্বালিয়ে দেয়া কিংবা সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হয়।

বিপুল পরিমাণ পুঁজি বিনিয়োগ করে বিলাস দ্রব্য উৎপাদন করা এবং বিজ্ঞাপন প্রচার, বিনামূল্যে বণ্টন, নানারূপ অর্থহীন কথা বলা ও লালসা দানের সাহায্যে তার চাহিদা তীব্র করে তোলার পন্থা গ্রহণ করা হচ্ছে এবং যেসব অসহায় গরীব মধ্যবিত্ত লোক নিজেদের জীবনের কর্তব্যসমূহও পূর্ণ মাত্রায় সম্পন্ন করতে সমর্থ নয়, তাদের নিত্য নৈমিত্তিক প্রয়োজন হিসেবে তা তাদের স্কন্ধে জবরদস্তি চাপিয়ে দেয়া হয়েছে।

এটাও দেখা গেছে যে, জনসাধারণের পক্ষে যেসব দ্রব্য প্রয়োজনীয় ও অত্যন্ত জরুরী, তার উৎপাদন ও পরিবেশনের ক্ষেত্রে পুঁজি ও শ্রম নিয়োগ না হয়ে সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহের কাজে উদার-অবাধ নীতিতে ব্যয় করা হচ্ছে। কেবলমাত্র এ কারণে যে, প্রথম প্রকারের কাজ অপেক্ষা দ্বিতীয় প্রকারের কাজে অধিক মুনাফা লুটার সুযোগ রয়েছে।

পুঁজিবাদী সমাজে এক ব্যক্তি কিংবা একটি দল স্বাস্থ্য, চরিত্র ও সভ্যতা-সংস্কৃতির পক্ষে অত্যন্ত মারাত্মক পণ্যকে শুধু পুঁজির জোরে আকর্ষণীয় ও চাকচিক্যময় করে তোলে। প্রকাশ্যভাবে জনগণের নিম্নশ্রেণীর লালসাকে উত্তেজিত করে তাদের দ্বারা এ জিনিস ক্রয় করানো হয় এবং পরিণামে তাদেরকে একেবারে দেউলিয়ার খাতায় নাম লিখাতে বাধ্য করা হয়। এমন কি শেষ পর্যন্ত তারা নিজের ও পরিবারবর্গকে পেট ভরে খাদ্য দিতেও অসমর্থ হয়ে পড়ে।

সর্বাপেক্ষা মারাত্মক ও ধ্বংসাত্মক পন্থা অবলম্বন করা হয় যে, নিজেদের ব্যবসায়ী ও আর্থিক স্বার্থ লাভের জন্য বিভিন্ন দুর্বল জাতির স্বাভাবিক অধিকারসমূহ হরণ করা হয়। দুনিয়াকে বিভিন্ন অঞ্চলে বণ্টন করে প্রত্যেক জাতির বড় বড় ধনিক-বণিক, মহাজন, শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের দ্বারা তাদের নিজ নিজ জাতিকে অস্বাভাবিক ও সীমাহীন স্বার্থপর করে দিয়ে পরস্পরকে এক চিরস্থায়ী দ্বন্দ্ব ও সংগ্রামে লিপ্ত করা হয়। ফলে না যুদ্ধ করে এ পরিস্থিতিকে আয়ত্বাধীন করা যেতে পারে, না সন্ধিচুক্তির মারফতে।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন করা যায় যে, ব্যক্তিদেরকে ব্যক্তি স্বার্থের জন্য স্বাধীন ও নিরঙ্কুশভাবে কাজ করার সুযোগ দিলে সামগ্রিক স্বার্থের জন্য কাজ স্বতই সম্পন্ন হবে বলে কোনো আশা করা যেতে পারে কি ? এটা দ্বারা বরং তারা নিজেরাই বিশ্ব সমক্ষে এই প্রমাণ পেশ করলো যে, নিরঙ্কুশ ও অবাধ অর্থ শোষণের নীতি কখনোই উদার ও নিঃস্বার্থ হতে পারে না। বিশেষত, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শক্তিও যদি এককেন্দ্রিভূত হয়, আর তারা নিজেরাই যদি আইন প্রণেতাও হয়, তবে ব্যক্তিদের বেশীর ভাগ প্রচেষ্টাই সামাজিক স্বার্থে নিযুক্ত হবে না ; বরং জাতি ও সমষ্টির স্বার্থই ব্যক্তিস্বার্থের অগ্নিযজ্ঞে আত্মাহুতি দিতে বাধ্য হবে।

ছয় ঃ এসব বিপর্যয়কারী কর্মকাণ্ডের উপর পুঁজিবাদীগণ অপর একটি মারাত্মক নীতি অবলম্বন করেছে। তারা সমাজের ব্যক্তিগণকে পুঁজি সংগ্রহ করে তা সুদের ভিত্তিতে লগ্নি করার অবাধ অধিকার দান করেছে। একটি ঘৃণ্য পাপপ্রথা হিসেবে দুনিয়ায় প্রায় সমাজেই সুদ প্রথা চিরদিন চালু রয়েছে। দুনিয়ার আইন-কানুনও অনেক সময় ঘৃণা সহকারে তাকে বরদাশত করেছে।

কিন্তু প্রাচীন আরব জাহেলিয়াতের পর আধুনিক পাশ্চাত্য জাহেলিয়াতের বুর্জোয়া চিন্তাবিদগণই এ প্রথাকে ব্যবসায়ের একমাত্র বুদ্ধিসম্মত পন্থা ও গোটা অর্থব্যবস্থায় একমাত্র সুষ্ঠু ভিত্তি হওয়ার মর্যাদা দিয়ে ছেড়েছে এবং দেশে এমন ধরনের আইন প্রণয়নের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছে যে, ঋণ গ্রহণকারীর পরিবর্তে সুদ গ্রহণকারীর স্বার্থেই পৃষ্ঠপোষকতা করা হয়েছে। এ বিরাট ভুল ও তার পরিণতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা অন্যত্র করা যাবে, কিন্তু প্রসঙ্গত এখানে সংক্ষেপে এ ইংগিত করাই যথেষ্ট হবে যে, সুদে ঋণদান, ঋণ গ্রহণ ও আর্থিক ভিত্তিরূপে গ্রহণ করার ফল এই হলো যে, অবাধ শিল্প বিপ্লবের কারণে শক্তি, সম্পদ, প্রভাব-প্রতিপত্তি, সকল স্বার্থ ও মুনাফার স্রোত পূর্বাপেক্ষাও অধিকতর তীব্রবেগে প্রবাহিত হতে শুরু করেছে এবং এর পরিণতি স্বরূপ সমাজ জীবনের ভারসাম্যহীনতা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছেছে।

অতপর যারা কোনো না কোনো উপায়ে কিছু কিছু ধন-সম্পদ করে বসতে পেরেছে, সমাজের মধ্যে তারাই সৌভাগ্যের অধিকারী হয়ে বসেছে। যে ব্যক্তি সুদভিত্তিক ব্যবসায়ে মূলধন নিয়োগ করতে সমর্থ হয়ে নিশ্চিন্তে ঘরে বসেছে, তার তুলনায় অধিক মেধাসম্পন্ন, শ্রমমেহনতকারী ব্যবসায়ী, পরিকল্পনা রচনাকারী ও সংগঠন প্রতিষ্ঠাকারী এবং প্রাণপণ খেটে সকল অবস্থায় ব্যবসায় পরিচালনাকারী ও প্রয়োজনীয় পণ্যের উৎপাদন ও সরবরাহের যাবতীয় কার্য সম্পাদনকারী লোকেরা একেবারে হীন ও উপেক্ষণীয় হয়ে বসলো। কেননা এ সমস্ত কাজের মুনাফা একেবারে অনিশ্চিত ও অনির্দিষ্ট ; কিন্তু সুদী কাজের মুনাফা নির্দিষ্ট এবং সর্বতোভাবে অবধারিত। উল্লেখিত কার্যাবলীতে ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে ; কিন্তু প্রথমোক্ত কাজে নির্দিষ্ট ও খাঁটি মুনাফা একেবারে নিশ্চিত। ঐসব লোক ব্যবসায়ের ভালমন্দ ও উন্নতি অবনতির বিষয়ে চিন্তা করতে বাধ্য ; কিন্তু সুদী কারবারী ব্যক্তি কেবলমাত্র সুদ সম্বন্ধেই আগ্রহান্বিত। ব্যবসায়ে উন্নতি পরিলক্ষিত হলে সে তাতে অকুণ্ঠিত চিত্তে মূলধন বিনিয়োগ করতে থাকে। এমনকি শেষ পর্যন্ত যখন মুনাফা লাভের সমস্ত সম্ভাবনা লোপ পেয়ে যায়, ব্যবসায় মন্দা হয়ে আসে, তখন সে সাহায্যের হাত প্রসারিত করে না বরং পূর্বে নিয়োগকৃত মূলধন ফেরত নিতে শুরু করে। ফলে সমগ্র দুনিয়ার ব্যবসায়ে এক কঠিন মন্দাভাবের সৃষ্টি হয়। প্রত্যেক অবস্থায়ই ক্ষতি, অসুবিধা, বিপদ সবকিছু ভুগতে হয় অন্য লোকদের; সুদী ব্যবসায়ে কেবলমাত্র মুনাফা কম-বেশীর ও হ্রাস-বৃদ্ধির সম্মুখীন হতে হয় মাত্র। ব্যবসায়ী, শিল্পপতি ও জমিদারই নয় দেশীয় সরকারসমূহ পর্যন্ত তার গোলাম হয়ে বসে। গভর্নমেন্ট তারই দেয়া টাকা দ্বারা রাস্তাঘাট, পুল নির্মাণ, খাল খনন ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজ করে এবং শুধু কয়েক বছর পর্যন্ত নয়, কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত এক এক ব্যক্তির নিকট থেকে কর আদায় করে তার বাড়ী পর্যন্ত পৌঁছে দেয়া হয়। এমনকি জাতি যদি কোনো যুদ্ধের সম্মুখীন হয়ে পড়ে তবে তাতে যারা নিহত হবে, যাদের ঘর-বাড়ী বরবাদ হবে, কিংবা যারা পিতা পুত্র অথবা স্বামী হতে বঞ্চিত হবে, জাতীয় অর্থভাণ্ডার তাদের কারো দায়িত্ব গ্রহণ করতে একটুও প্রস্তুত হয়নি। কিন্তু জাতির যে মুষ্টিমেয় লোকেরা যুদ্ধের জন্য টাকা কর্জ দিয়েছে, তাদের টাকা একশত দুইশত বছর ধরে আদায় করার জন্য এ যুদ্ধে নিহত লোকদেরই চাঁদা দিতে হয়। এভাবে সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থা সমাজের সম্পদ উৎপাদক মূল কার্যকারকের ((Main factors) প্রতি সর্বপ্রকারে ও সর্বদিকে এক সর্বাধিক না ইনসাফী করে থাকে। এ অর্থব্যবস্থা সমগ্র জাতীয় অর্থনীতির কর্তৃত্ব মুষ্টিমেয় কয়েকজন পুঁজিদারের হাতে সমর্পণ

করেছে। সমাজের একবিন্দু কল্যাণ ও উন্নতির দিকে এদের যেমন লক্ষ নেই, অনুরূপভাবে সমাজ ও সমষ্টির পক্ষে কল্যাণকর কোনো কাজও তারা সম্পন্ন করে না। কিন্তু যেহেতু গোটা অর্থনৈতিক কারবারের প্রাণ অর্থাৎ মূলধন—তাদের কুক্ষিগত হয়ে আছে এবং দেশী আইন তা সঞ্চয় করা ও সুদের বিনিময়ে বিনিয়োগ করার পূর্ণ অধিকার তাকে দিয়েছে, এজন্য তারা শুধু সমাজের সামগ্রিক শ্রমের উৎপন্ন সম্পদে প্রধান অংশীদার হয়ে থাকেনি বরং গোটা সমাজকে নিজেদের স্বার্থের দাস বানাবার এবং বিভিন্ন জাতি ও দেশসমূহের ভাগ্য নিয়ে মারাত্মক খেলা খেলবার শক্তিও তাদেরই করায়ত্ব রয়েছে।

সাত ঃ আধুনিক পুঁজিবাদী অর্থনীতির উল্লেখিত ভিত্তিসমূহের উপর যে নবতর সমাজ গঠিত হয়েছে, তাতে সহানুভূতি, সহযোগিতা, দয়া, অনুগ্রহ ও এ ধরনের গুণ-বৈশিষ্ট্যের কোনো স্থানই নেই। এরূপ সমাজ ব্যবস্থায় অপর লোকের তো কথাই নেই—আপন সহোদর ভাইয়েরও অপর ভাইয়ের নিকট থেকে সাহায্য পাওয়ার কোনো অধিকার স্বীকৃত হয়নি। একদিকে প্রত্যেক নূতন যন্ত্রের আবিষ্কার শত সহস্র মানুষকে এক মুহূর্তেই বেকার করে দেয়। অপরদিকে সরকার, সমাজ, কারখানা মালিক—কারো উপর এ বেকার ও রুযী-রোযগারহীন, অক্ষম ও পংগু লোকদের কোনো দায়িত্বই রইলো না। এখানেই শেষ নয়, এ নূতন ব্যবস্থা এমন অবস্থার উদ্ভব করলো এবং জনসাধারণের মধ্যে এমন নৈতিকতার সৃষ্টি করলো যে, পতিতের হাত ধরে উঠাবার কর্তব্যবোধ কারো মধ্যে বাকী রইলো না। দুর্ঘটনা, রোগ, মৃত্যু, জরা ও অন্যান্য সমস্ত প্রতিকূল অবস্থার যে প্রতিবিধানই এ সমাজে পেশ করেছে তা সবই করা হয়েছে উপার্জনশীল লোকদের জন্য এবং এমন সব লোকের জন্য যারা প্রয়োজনের অতিরিক্ত সঞ্চয়যোগ্য পরিমাণে রোযগার করছে। কিন্তু যারা কিছুমাত্র উপার্জন করতে পারছে না কিংবা মাত্র প্রাণ রক্ষা পরিমাণ উপার্জন করে, তারা তাদের কঠিন দূরবস্থার সময়ে কোথা থেকে সাহায্য লাভ করতে পারবে ? আধুনিক পুঁজিবাদীদের নিকট একমাত্র উত্তর এই যে, এরূপ অসহায় ব্যক্তি মহাজনের নিকট নিজের বস্ত্র, তৈজষপত্র কিংবা স্ত্রী অলংকার বন্ধক রেখে বার্ষিক শতকরা তিন টাকা হিসেবে সুদের বিনিময়ে ঋণ গ্রহণ করবে। আর শেষকালে সুদসহ কর্জ আদায় করতে না পারলে তা আদায় করার জন্য সেই মহাজনেরই নিকট থেকে পুনরায় সুদের ভিত্তিতে ঋণ গ্রহণ করবে।

বস্তুত, সমাজের লক্ষ লক্ষ লোক যদি রুযী-রোযগারহীন হয়ে থাকে এবং কোটি কোটি লোক যদি এতোই স্বল্প পরিমাণে উপার্জনশীল হয় যে,

তারা নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দোকান ভর্তি থাকা সত্ত্বেও তা খরিদ করতে সমর্থ না হয়, তাহলে শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্যে উন্নতি কিরূপে সূচিত হতে পারে ? এজন্যই আমরা এ আশ্চর্য ধরনের অবস্থা দেখতে পাচ্ছি যে, দুনিয়ায় ব্যবহারোপযোগী উপায়-উপাদান বিপুল পরিমাণ বর্তমান রয়েছে, কোটি কোটি কর্মোপযোগী মানুষ ঘুরে মরছে এবং প্রয়োজনীয় পণ্যের অভাব সত্ত্বেও বিলাস দ্রব্য খরিদ করতে ইচ্ছুক কোটি কোটি লোকও বর্তমান রয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও দুনিয়ার কারখানাসমূহ নিজ সামর্থের অনুপাত অপেক্ষাও কম পণ্যোৎপাদন করছে। তাও আবার বাজারে স্তুপ হয়ে পড়ে থাকে এবং কেবল এজন্যই পড়ে থাকে যে, তাদের নিকট তা ক্রয় করার মত অর্থসম্পদ মজুদ নেই। লক্ষ কোটি লোককে এজন্য কর্মে নিয়োগ করা সম্ভব হচ্ছে না যে, যে সামান্য পরিমাণ পণ্য উৎপন্ন হয় তাও আবার বাজারে অবিক্রিত অবস্থায় স্তুপ হয়ে পড়ে থাকে। অপরদিকে পুঁজি ও প্রাকৃতিক সম্পদও যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহৃত হতে পারছে না। কেননা, যে সামান্য পরিমাণেও তা ব্যবহৃত হচ্ছে, তাই ফলপ্রসু হওয়া কঠিন ব্যাপার, অতিরিক্ত পুঁজি ও প্রাকৃতিক সম্পদ নিয়োগের দুঃসাহস করা তো দূরের কথা। এরূপ পরিস্থিতি স্বতই প্রমাণ করে যে, অবাধ নিরংকুশ অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মুনাফা লাভের প্রচেষ্টা স্বতই উপায়-উপাদানের উন্নয়ন ও উৎপাদন পরিমাণ বৃদ্ধির ব্যবস্থা করে বলে বুর্জোয়া চিন্তাবিদগণ পুঁজিবাদের অনুকূলে যে যুক্তি পেশ করে থাকেন, তা একেবারেই ভিত্তিহীন। বস্তুত এরূপ অবস্থায় উন্নতি ও উৎপাদন পরিমাণ বৃদ্ধি তো দূরের কথা অভিজ্ঞতার দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয়েছে যে, তারা নিজেদেরই অজ্ঞতার কারণে নিজেদেরই সঠিক মুনাফা লাভের পথেও প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে।

❒

সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম

পূর্ব অধ্যায়ে যে কারণগুলো বিশ্লেষণ করা হয়েছে, ঠিক সেই সবের দরুনই শিল্প-বিপ্লব উদ্ভূত সমাজ ও অর্থব্যবস্থায় বিভিন্ন প্রকার দোষ-ক্রুটি ও বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। পূর্বের পৃষ্ঠাসমূহে আমরা এর যে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছি, সেই সম্পর্কে গভীর চিন্তা-গবেষণা করলে একথা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হবে যে, বুর্জোয়া শ্রেণীর লোকেরা অবাধ অর্থনীতির সমর্থনে যেসব স্বাভাবিক মূলনীতি পেশ করেছিল, আলোচ্য ক্রুটি বিপর্যয় সেই কারণে সৃষ্টি হয়নি, বরং এ নির্ভুল নীতির সাথে তারা আরো যেসব ভুলের সংমিশ্রণ করেছিল প্রকৃতপক্ষে তাই ছিল এর মূলীভূত কারণ।

কাজেই সঠিক সময়ে এ ভুলগুলো সম্পর্কে যদি সজাগ হওয়া সম্ভব হতো এবং পাশ্চাত্যবাসীগণ যদি এ নবতর বিপ্লবী পর্যায়ে এক ভারসাম্যযুক্ত ও সুবিচারপূর্ণ অর্থব্যবস্থা গড়ে তুলতে সমর্থ হতো, তাহলে শিল্প-বিপ্লব তাদের ও সমগ্র বিশ্ব-মানবের পক্ষেই এক অপূর্ব নিয়ামত ও বিপুল কল্যাণের আকার হয়ে দেখা দিতো। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, পূর্বেও যেমন একাধিকবার তারা এ দুর্বলতা দেখিয়েছে, পাশ্চাত্য মন ও চরিত্র এ পর্যায়েও অনুরূপ দুর্বলতাই প্রদর্শন করেছে। ফলে পূর্বকালেও তারা যেমন বিভ্রান্ত হয়েছিল, পরবর্তীকালের ইতিহাসও এ অসামঞ্জস্যতা ও ভারসাম্যহীনতার পথেই ছুটে চলতে থাকে। জমির মালিক, গীর্জার পরিচালক ও কর্তা এবং রাজবংশসমূহ পূর্বে যে স্থানে দাঁড়িয়ে গোঁড়ামী, যুলুম ও অবাঞ্ছনীয় বাড়াবাড়ি করতো, বুর্জোয়া শ্রেণী বর্তমানে ঠিক সেই স্থানই দখল করে বসেছে এবং পূর্বে বুর্জোয়াগণ যে অবস্থায় পড়ে অধিকার দাবী, অভিযোগ এবং ক্রোধ ও প্রতিবাদের প্রতিমূর্তী হয়ে দাঁড়িয়েছিল, বর্তমানে সেই স্থান দখল করেছে শ্রমজীবি জনসাধারণ। পূর্বে জায়গীরদারী সমাজ ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত শ্রেণী নিজেদের অবাঞ্ছনীয় পার্থক্য তারতম্য এবং নিজেদের অবৈধ অধিকার ও অত্যাচারমূলক বাধা-বন্ধনের সমর্থনে দীন-ধর্ম, চরিত্র ও প্রাকৃতিক আইনসম্মত কয়েকটি সত্য কথাকে ভ্রান্তভাবে ব্যবহার করে বঞ্চিত জনতার মুখ বন্ধ করতে চেষ্টা করেছিল, বর্তমানে পুঁজি বাদী ব্যবস্থায় পরিতৃপ্ত শ্রেণীর লোকেরা ঠিক তাই করতে শুরু করেছে। পূর্বে বুর্জোয়া লোকেরা ক্রোধ, জিদ ও বিরক্তির সাথে জায়গীরদার ও পাদ্রীদের আসল ভুল অনুধাবন ও সঠিকরূপে তার প্রতিবাদ প্রতিবিধান করার পরিবর্তে তাদের বিরোধী দল যেসব মূল সত্যের আশ্রয় গ্রহণ করতো তার

বিরুদ্ধেই সর্বাধিক শক্তি ব্যয় করতো, বর্তমানে শ্রমজীবি জনগণ ও তাদের নেতৃবৃন্দ ঠিক অনুরূপভাবে ক্রোধ ও হিংসার দুর্নিবার চাপে সামঞ্জস্য ও ভারসাম্য পূর্ণমাত্রায় হারিয়ে ফেলে এবং বুর্জোয়া সমাজ সভ্যতার প্রকৃত ত্রুটি ও ভুলের উপর আঘাত হানার পরিবর্তে সেই প্রকৃত ও স্বাভাবিক মূলনীতিসমূহের উপর আক্রমণ চালায়—প্রথম সৃষ্টিকাল হতে যার উপর মানব সমাজ, সভ্যতা ও অর্থনীতির পুনর্গঠন হয়ে এসেছে।

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা তো নিজেদের সহস্র দুর্বলতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও কিছু না কিছু প্রতিভাবান ও শিক্ষিত ছিল। এজন্য তারা অভিযোগ ও অনমনীয়তার প্রচণ্ডতায় মনের ভারসাম্য কিছু না কিছু রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিল ; কিন্তু শতাব্দীকালের নিষ্পেষিত ও নিপীড়িত জনগণ—যাদের মধ্যে জ্ঞান প্রতিভা, মননশীলতা ও অভিজ্ঞতা প্রভৃতি সব জিনিসেরই সুস্পষ্ট অভাব বর্তমান ছিল—যখন দুঃখে, কষ্টে অস্থির ও ব্যাকুল হয়ে উঠলো এবং অভাব অভিযোগে তাদের হৃদয়পাত্র উচ্ছ্বসিত হয়ে গেল ; তারা রীতিমত হিংস্র ও বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো, তখন কোনো কথা গ্রহণ করার পূর্বে বুদ্ধি ও যুক্তির মানদণ্ডে তাকে যাচাই করে দেখার কোনো প্রশ্নই তাদের সামনে বর্তমান ছিল না। এ সময়ে যে নীতি ও পন্থা সর্বাধিক তীব্রতা ও প্রচণ্ডতা সহকারে তাদের ঘৃণা, ক্রোধ ও প্রতিশোধ গ্রহণ স্পৃহার দাবী পূরণে কার্যকরী মনে হয়েছে, তাই তাদের মনকে সর্বাধিক আকৃষ্ট করতে সমর্থ হয়েছে।

বস্তুত গরীব শ্রেণীর এ বিবৃতি, ক্রোধ ও আক্রোশের ফলে মতাদর্শের দুনিয়ায় যে সন্তানের জন্ম হয়, পরিভাষায় তাকেই 'সমাজতন্ত্র' নামে অভিহিত করা হয়।[১] আধুনিক পুঁজিবাদের জন্মের পর অর্ধ শতাব্দীকাল অতিক্রান্ত হওয়ার মধ্যেই তার জন্ম হয় এবং তার জন্মের পর অর্ধ শতাব্দী কাল অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেই তার সর্বগ্রাসী বিপর্যয় ও ধ্বংসাত্মক কর্মতৎপরতায় পৃথিবীর পাত্র উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে।

---

১. 'সোশ্যালিজম'-এর মূল অর্থ সামাজিকতা। আধুনিক সামগ্রিকতা পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তি—ব্যক্তিতন্ত্রের বিপরীত অর্থ প্রকাশের জন্যই এ পরিভাষার উদ্ভাবন হয়েছে। কার্লমার্কসের পূর্ব হতেই এ নামে অসংখ্য ও বিভিন্ন মতাদর্শ এবং চিন্তা-কল্পনার আদর্শ উপস্থাপিত করা শুরু হয়েছে ; এগুলোর মিলিত উদ্দেশ্য ছিল এমন একটি জীবনব্যবস্থা গড়ে তোলা, যাতে সামগ্রিক ও সমষ্টিগতভাবে সমগ্র সমাজের কল্যাণ হতে পারে। কিন্তু কার্যত তা সবই কাগজের উপর মুদ্রিতই রয়ে গেল। মার্কস এসে এ সাধারণ দাবীর জবাবে এক বিশেষ ধরনের সমাজতন্ত্র পেশ করলেন, যাকে 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র' 'মার্কসবাদ', 'কমিউনিজম' প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়। এখানে এ সম্পর্কেই আলোচনা করা হচ্ছে। কেননা যমীনের বুকে তাই শিকড় গেড়ে বসেছে। পারিভাষিক সূক্ষ্মতাকে ইচ্ছা করেই আমরা পরিত্যাগ করেছি এবং প্রচলিত ভাষায় যেসব শব্দ ব্যবহৃত হয় ও সাধারণ পাঠকগণ যেসব শব্দের সাথে সুপরিচিত, যা সহজবোধ্য, আমরা এখানে তাই ব্যবহার করবো।

সমাজতন্ত্র ও তার মূলনীতি

এ নবতর মতবাদের রচয়িতাগণ সর্বপ্রথমই আক্রমণ চালায় 'মালিকানা অধিকারের' উপর। তারা বললো, এটাই হচ্ছে সকল প্রকার বিপর্যয়ের মূল কারণ। পরিধেয় বস্ত্র, নিত্য ব্যবহার্য তৈজষপত্র, ফার্নিচার ও এ ধরনের অন্যান্য জিনিসগুলো ব্যক্তিগত মালিকানাধীন থাকলে কোনো দোষের কারণ ঘটে না। কিন্তু জমি, ক্ষেত, বস্ত্র কারখানা ও হাতিয়ার প্রভৃতি অর্থোৎপাদক শক্তি ও জিনিসগুলোর উপর কখনই ব্যক্তিগত মালিকানা স্থাপিত হওয়া উচিত নয়। কেননা কেউ উক্ত জিনিসগুলোর মধ্যে কোনো একটির মালিক হলেই সে তা দ্বারা ধন উৎপাদন করবে, ধন উৎপাদন করলে তা নিশ্চয়ই সংগ্রহ ও সঞ্চয় করবে। তখন সে আরো কিছু জমি, ক্ষেত কিংবা বস্ত্র কারখানা ক্রয় করে অর্থোৎপাদনের উপায় অধিক বাড়িয়ে ফেলবে। তা বাড়িয়ে ফেললে নির্দিষ্ট পরিমাণ বেতন, মজুরী কিংবা ঠিকার ভিত্তিতে অন্যান্য লোককে কাজে খাটাবে, আর যখনই সে এটা করবে, তখন সে বুর্জোয়া পুঁজিবাদের মতো সমস্ত কাজই করবে। কাজেই যে মূল হতে এরূপ বিপদের উদ্ভব হয়, তাই উৎপাটিত করে দাও। "না থাকবে বাঁশ, না বাজবে বাঁশরী।"

প্রশ্ন জাগলো, ব্যবহার্য দ্রব্য সামগ্রীর মতো উৎপাদন উপায়ের উপর ব্যক্তিগত মালিকানা অধিকারও মানব সমাজে কিছুমাত্র নূতন জিনিস নয়, এমনকি এটা কেবল বুর্জোয়া পুঁজিদারদের নিজস্ব রচিত ও মনগড়া কিছু নয়। প্রকৃতপক্ষে এটা সমাজ জীবনের ভিত্তি, প্রাচীনকাল থেকেই মানব সমাজ ও অর্থনীতির বুনিয়াদ তার উপরই স্থাপিত হয়ে এসেছে। এ ধরনের একটি বুনিয়াদী ব্যবস্থাকে উৎপাটিত করার সিদ্ধান্ত করা কি এতোই সহজ কাজ ?

এর উত্তরে সহসাই একটি পূর্ণাংগ ইতিহাস রচনা করে পেশ করা হলো এবং বলা হলো, মানব সমাজের প্রথম দিন থেকেই উৎপাদন উপায়ের উপর ব্যক্তিগত মালিকানার কোনো অধিকার স্বীকৃত হয়নি পরবর্তীকালের শক্তিমান শ্রেণীর লোকেরা নিজেদের স্বার্থের বশবর্তী হয়েই এটা সমাজ বুকে প্রতিষ্ঠিত করেছে মাত্র।

বলা হলো, দুনিয়ার সমস্ত ধর্ম সকল প্রকার নৈতিক বিধান এবং দুনিয়ার সমস্ত আইন-কানুনেই ব্যক্তিগত মালিকানার এ অধিকার আবহমানকাল থেকে স্বীকৃত হয়ে এসেছে, তার মধ্যে কোনো একটিও উৎপাদন উপায়ের উপর ব্যক্তিগত মালিকানার ভিত্তিতে গড়া সমাজ ও অর্থনীতিকে ভুল বলে কোনোকালেই মনে করেননি।

উত্তরে নিমেষমাত্র চিন্তা না করেই বলা হলো যে, ধর্ম, নৈতিকতা ও আইন প্রত্যেক যুগের প্রভাবশালী লোকদের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। উৎপাদন উপায়ের উপর এককালে লোকের ইজারা কায়েম হয়েছে, তাদের নিজেদের এ একচেটিয়া মালিকানাকে সুরক্ষিত ও সুদৃঢ় করে রাখার জন্য কিছু মতবাদ, কিছু রীতিনীতি ও আইন-বিধানের প্রয়োজন দেখা দেয়। যারা এগুলোকে তাদের মতলব মতো রচনা করে পেশ করলো, তারা সমাজে নবী, পয়গাম্বর, মুনী-ঋষি, নৈতিকতার শিক্ষক এবং শরীয়াতদাতা ও আইন রচয়িতার মর্যাদা লাভ করলো। শ্রমজীবিগণ দীর্ঘকাল পর্যন্ত এ গোলক ধাঁধায় নিমজ্জিত হয়ে রয়েছে, কিন্তু এখন তারা তা চূর্ণ করেই ছাড়বে।

বলা হলো, অধিকারসমূহ নির্মূল করার জন্য এক কঠিন ও সর্বাত্মক দ্বন্দ্ব এবং অন্তহীন সংগ্রাম সৃষ্টি করার প্রয়োজন হবে এবং তাতে প্রত্যেকটি জাতির বিভিন্ন মতাবলম্বী লোকদেরকে পারস্পরিক সংগ্রামে লিপ্ত হতে হবে, গ্রামে-গ্রামে আর মহল্লায় মহল্লায় শ্রেণী দ্বন্দ্বের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে।

এর জবাবে অনতিবিলম্বে এক অভিনব ইতিহাস-দর্শন রচনা করে পেশ করা হলো। তাতে দাবী করা হলো যে, মানব সভ্যতার সমগ্র ক্রমবিকাশই সম্পন্ন হয়েছে শ্রেণী সংগ্রামের মাধ্যমে। এছাড়া ক্রমবিকাশ লাভের আর কোনো পথই থাকতে পারে না।

এরপরও প্রশ্ন জাগলো যে, নিজের ব্যক্তিগত মুনাফা ও স্বার্থের জন্য কাজ করা প্রত্যেকটি মানুষের প্রকৃতি নিহিত এক মৌলিক ভাবধারা, প্রত্যেক মানব শিশুই মায়ের গর্ভ থেকে এ প্রবণতা নিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়। ব্যক্তিদের নিকট থেকে উৎপাদন উপায়ের মালিকানা অধিকার কেড়ে নিলে এবং নিজ চেষ্টা সাধনা অনুপাতে মুনাফা লাভের সুযোগ না দিলে শ্রম ও সাধনা করার জন্মগত ভাবধারাই নিঃশেষ হয়ে যাবে। আর এটা শেষ পর্যন্ত মানবীয় সভ্যতা ও তামাদ্দুনের পক্ষে অত্যন্ত মারাত্মক প্রমাণিত হবে।

সাথে সাথে এর উত্তরে বলা হলো ঃ প্রকৃতি-জন্মগত ভাবধারা উত্তরাধিকার হিসেবে লব্ধ প্রবণতা—এটা তো সবই বুর্জোয়াদের আবিষ্কৃত কথাবার্তা। মানুষের মধ্যে এ ধরনের কোনো জিনিস আদপেই মওজুদ নেই। তার সকল ঝোঁকপ্রবণতা ও ভাবধারা কেবলমাত্র সামাজিক পরিবেশেরই ফল। এক ধরনের পরিবেশ পরিবর্তন করে ভিন্ন রকমের পরিবেশে দাঁড় করে দিলেই তার মন-মগজ সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপ কথা চিন্তা করতে শুরু করবে। অন্য প্রকারের ভাবধারায় তার হৃদয় উদ্বেলিত হয়ে উঠবে। তার মন অভিনব দৃষ্টিভঙ্গি লাভ করবে। ব্যক্তিগত মালিকানার ব্যবস্থা যতদিন কায়েম থাকবে, ততদিন

'ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যপূর্ণ মানসিকতা' বর্তমান থাকবে। আর যখনই সামাজিক মালিকানা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে, তখনই সমস্ত মানুষ 'সামাজিক মনোভাব সম্পন্ন' হয়ে উঠবে।

জিজ্ঞেস করা হলো, ব্যক্তি-মালিকানা খতম করে দিয়ে সমগ্র অর্থনৈতিক কার্যক্রমকে কিভাবে পরিচালিত করা যাবে ? উত্তর দেয়া হলো যে, সমগ্র উৎপাদন উপায়-জমি-খেত, কারখানা ও সকল প্রকার ব্যবসায় ও শিল্প প্রতিষ্ঠান ব্যক্তির কব্জা থেকে বের করে জাতীয় মালিকানা বানিয়ে দেয়া হবে। এ প্রতিষ্ঠানসমূহে যারা কাজ করবে তাদের মধ্যেই তার মুনাফা বণ্টন করে দেয়া হবে। এ কর্মীদের ভোটেই যেসব ব্যবস্থাপক নির্বাচিত হবে, তাদের দ্বারাই পরিচালিত হবে সমগ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা।

প্রশ্ন উঠলো, বর্তমানে যারা জমি, কারখানা ও অন্যান্য উৎপাদন উপায়সমূহের মালিক হয়ে আছে, তাদের মালিকানা খতম করার ও সামাজিক জাতীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠিত করার উপায় কি হবে ? এ প্রশ্নের জবাবে দুটি স্বতন্ত্র কথা বলা হয়েছে ঃ

১. এক নীতির অনুসারীগণ এর উত্তরে বলেছে যে, এ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য গণতান্ত্রিক পন্থা অবলম্বন করা হবে। জনমতের পরিবর্তন করে রাষ্ট্র শক্তিকে করায়ত্ব করতে হবে এবং আইন প্রণয়নের সাহায্যে ক্রমশ কৃষি, সম্পত্তি, শিল্প ও ব্যবসাসমূহকে (কখনো ক্ষতিপূরণ দিয়ে এবং কখনো ক্ষতিপূরণ ছাড়াই) জাতীয় ও সামগ্রিক মালিকানাভুক্ত করে নেয়া হবে। এ মতাবলম্বী লোকদেরকেই বিশেষভাবে স্যোশালিষ্ট বা সমাজতন্ত্রবাদী বলা হয়। কখনো এ মতকে বলা হয় 'ক্রমবিকাশমান সমাজতন্ত্র'।

২. অপর মতাবলম্বীগণ মনে করে, গণতান্ত্রিক কার্যক্রম কোনো মৌলিক পরিবর্তন সূচিত করতে পারে না। সেই জন্য আবশ্যক এবং অরিহার্য হচ্ছে বিপ্লবাত্মক কর্মসূচী। নিঃস্ব শ্রমজীবি জনতাকে সংঘবদ্ধ করা হবে, মালিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে সম্ভাব্য সকল উপায় ও পন্থায় যুদ্ধ ও সংগ্রাম করা হবে। বুর্জোয়া সরকারের ভিত্তি উৎপাটন করা হবে এবং মজুর-মেহনতী লোকদের ডিক্টেটরী শাসন কায়েম করা হবে। অতপর জমির মালিকদের থেকে জমি, কারখানার মালিকদের থেকে কারখানা এবং ব্যবসায়ীদের হাত থেকে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহ বলপূর্বক কেড়ে নেয়া হবে, এ উদ্দেশ্যের পথে যে বাধা দিতে আসবে তাকে ধ্বংসের করালগ্রাসে নিক্ষেপ করা হবে। সকল প্রকার শ্রেণী বৈষম্যকে খতম করে দিয়ে সমগ্র দেশবাসীকে একটিমাত্র শ্রেণীতে (নিজ হাতে শ্রমের বিনিময়ে উপার্জনকারী শ্রেণীতে) পরিণত করা হবে

এবং ব্যক্তিগত পর্যায় মজুরীর বিনিময়ে কাউকেও কর্মে নিয়োগ করা ও তার মুনাফা গ্রহণকে আইন করে বন্ধ করে দেয়া হবে।[১]

এভাবে বিপ্লব যখন সম্পূর্ণতা লাভ করবে এবং পুঁজিদার শ্রেণীর পক্ষে পুনরুত্থান লাভ করার কোনো আশংকা অবশিষ্ট থাকবে না, তখন এ ডিক্টেটরী শাসন ব্যবস্থা স্বতই (কিভাবে তা আল্লাহ্ই জানেন) শুষ্ক পাতার মত ঝরে পড়বে। অতপর আপনা থেকেই (কিন্তু কিভাবে ?) এমন একটি রাষ্ট্রব্যবস্থা তার স্থান অধিকার করে বসবে, যেখানে সরকার যন্ত্র ও বলপ্রয়োগ ছাড়াই জীবনের সমগ্র বিভাগ লোকদের পারস্পরিক ইচ্ছা, সন্তোষ, পরামর্শ ও সহযোগিতার ভিত্তিতে সুন্দররূপে চলতে থাকবে। সমাজ পরিবর্তনের এ পন্থা ও মতকে বলা হয় 'বিপ্লবী সমাজতন্ত্র'। একে 'বলশেভিকবাদ' নামেও অভিহিত করা হয়। এর দার্শনিক নাম 'মার্কসবাদ' কিন্তু বর্তমানে দুনিয়ার লোকের নিকট এটাই 'কমিউনিজম' নামে পরিচিত ও প্রখ্যাত।

সত্তর আশী বছর পর্যন্ত সমাজতন্ত্রের এ নবতর মত অসংখ্য শাখা-প্রশাখা ও বিভিন্ন প্রকারের চিন্তা-পদ্ধতিসহ ইউরোপ ও তার প্রভাবান্বিত দেশসমূহে প্রচারিত হতে থাকে। প্রথম দিক দিয়ে এটা ছিল কয়েকজন বিভ্রান্ত লোকের পাগলামী। তার যুক্তি, পদ্ধতি, প্রমাণ ও ফল সবই ছিল অর্থহীন প্রলাপমাত্র। আর কেবলমাত্র ক্রুদ্ধ ও বিক্ষুব্ধ মজুর-শ্রমিকদের মধ্যেই তা জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল (কোনো বুদ্ধি ও জ্ঞান-ভিত্তির দৌলতে নয়, শুধু ক্ষিপ্ত ও উদ্বেলিত আবেগ-উচ্ছ্বাসের ভিত্তিতেই এ কার্যক্রম চলছিল) কিন্তু পাশ্চাত্যবাসীদের অসংখ্য দুর্বলতার মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য ও চমৎকার দুর্বলতা এই যে, যে কোনো প্রকার উগ্রতা ও বিপ্লবাত্মক ভূমিকা তাদেরকে মুগ্ধ করে, আকৃষ্ট করে। বিশেষভাবে তা যদি নেহায়েত বাজে জিনিস হয়, অর্থহীন পাগলামী হয় এবং তাকে যদি সকল প্রকার সর্বসমর্থিত সত্যকে নির্লজ্জের মত অস্বীকার-অগ্রাহ্য করে উদাত্ত কণ্ঠে নির্ভীকচিত্তে পেশ করা হয়, আর নিজেদের দাবীকে খানিকটা বৈজ্ঞানিক পন্থায় সুসংবদ্ধ ও মার্জিত করে নেয় এবং তার ফলে যদি তাতে একটি সিষ্টেম গড়ে উঠে[২] তবে তো

১. মনে রাখতে হবে যে, কমিউনিষ্ট মতবাদের দৃষ্টিতে কোনো দর্জী বা বাবুর্চী ব্যক্তিগতভাবে কাপড় সেলাই করে কিংবা রুটী তৈরি করে অপরকে দিলে এ কাজ সংগত হবে। কিন্তু সে যদি কাউকেও মজুরী বা বেতনের বিনিময়ে নিযুক্ত করে এবং নিজের এ কাজে তার সাহায্য গ্রহণ করে, তবে তখনই সে 'বুর্জোয়া' হয়ে যাবে। তার সমস্ত কাজ এমন এক কঠিন অপরাধে পরিণত হবে, যার কমছে কম দণ্ড হচ্ছে সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ।

২. এ উক্তির মূলে কোনো ভৌগলিক হিংসা বা বিদ্বেষের স্থান নেই। প্রাচ্যে পশ্চিমপন্থী মানসিকতাসম্পন্ন যেসব লোক রয়েছে তাদের অবস্থা এদের তুলনায় আরও নিকৃষ্ট ধরনের। পশ্চিমী লোকদের মানসিক অবস্থা তো অনেকটা উন্নত। তারা জোরদার কথা শুনে আকৃষ্ট হয় এবং একটি সিষ্টেম বা বৈজ্ঞানিক পন্থা ও পদ্ধতিকে পসন্দ করে। কিন্তু এ দেশের যেসব গোলাম মানসিকতাসম্পন্ন লোকের জন্য হচ্ছে তারা পশ্চিমের যে কোনো নেতার কথা অন্ধভাবে মেনে নেয় এবং তাতেই মুগ্ধ ও প্রভাবান্বিত হয়ে যায়।

আর কোনো কথাই নেই। আলোচ্য বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রে এ গুণগুলো পূর্ণমাত্রায় বর্তমান ছিল। এ কারণে নিম্নমধ্য শ্রেণীর অসংখ্য প্রতিভাবান লোক এবং বুর্জোয়া শ্রেণীর কোনো কোনো পাগল কিংবা কোনো চতুর ব্যক্তি এ মতবাদের দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। এ মতের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ এবং তার প্রচার ও প্রোপাগাণ্ডার জন্য বই-পুস্তক, পত্র-পত্রিকার স্তূপ সৃষ্টি হতে শুরু হয়। দুনিয়ার বিভিন্ন অংশে সমাজতান্ত্রিক মতের সমর্থক অসংখ্য পার্টি ও দল সংঘবদ্ধ হয়ে উঠে এবং শেষ পর্যন্ত অসংখ্য মানুষ বিশেষ গুরুত্ব সহকারে মনে করতে শুরু করে যে, এ মতবাদের ভিত্তিতে একটি সমাজ-তামাদ্দুন ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব।

কমিউনিজম ও তার লাভ ক্ষতি

নিয়মতান্ত্রিক বা ক্রমবিকাশমান কমিউনিজমের কোনো কৃতিত্ব বা অবদানই এখন পর্যন্ত বিশ্বসমক্ষে উপস্থাপিত হয়নি, এর দরুন ব্যক্তিগত পুঁজিবাদকে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রূপায়িত করার বাস্তব প্রক্রিয়া এবং তার ফলাফল সম্পর্কে কেনো ধারণা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এজন্য আমরা তার পরিবর্তে বিপ্লবী কমিউনিজমের কীর্তিকলাপের যাচাই ও বিচার করবো। এটা ১৯১৪-১৮ সনের প্রথম মহাযুদ্ধের সুযোগ গ্রহণ করে রাশিয়ায় কার্যতঃ এক বিপ্লব সৃষ্টি করে এবং স্থায়ী আদর্শ, মতবাদ ও দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে এক পূর্ণাঙ্গ সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়।[১]

রুশীয় কমিউনিজম বিগত কয়েক বছর পর্যন্ত কঠিন বিতর্কমূলক আলোচনার বিষয়ে পরিণত রয়েছে। ফলে তার লাভ-লোকসান যাচাই করার ব্যাপারে সমর্থক ও বিরোধী—উভয়ের তরফ থেকেই যথেষ্ট দ্বন্দ্ব ও টানা-হেঁচড়া করা হয়েছে।

তার সমর্থকগণ তার মুনাফার খাতে এমন অনেক জিনিসই শামিল করে দিয়েছে, যা প্রকৃতপক্ষে কমিউনিজমের নিজস্ব নয়। বরং তা যোগ্যতাসম্পন্ন ও সক্ষম লোকদের হাতে শাসনব্যবস্থা কুক্ষিগত হওয়ারই ফল মাত্র। পক্ষান্তরে তার বিরোধী লোকগণ তার এমন কতগুলো দোষ ও ত্রুটি দেখাতে চায়, যা মূলত কমিউনিজমের কোনো দোষ নয়। বরং যালেম ও সংকীর্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন লোকদের ক্ষমতাসীন হওয়ার কারণেই তা দেখা দিয়েছে।

রুশ সমর্থকদের একটি নীতি এই যে, তারা 'জার' আমলের রাশিয়ার বৈজ্ঞানিক, মানসিক, শৈল্পিক ও তামাদ্দুনিক অবস্থার তুলনা করে এবং বিয়োগ

১. মনে রাখা আবশ্যক যে, সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে কর্মনীতির। যাবতীয় উৎপাদন উপায়কে জাতীয়করণ সম্পর্কে উভয়েই সম্পূর্ণ একমত। এতদুভয়ের মধ্যে এ দিক দিয়ে বিন্দুমাত্র মত পার্থক্য নেই। কাজেই কর্মনীতি ছাড়া সম্পত্তি উৎপাদন উপায় জাতীয়করণ এবং তার ফলাফল সম্পর্কে যা কিছু লিখিত হবে, তা উভয় মতবাদ সম্পর্কেই প্রযোজ্য হবে।

ফল হিসেবে যতখানি উন্নতি প্রমাণিত হয়, তার সবই কমিউনিজমের জমার খাতায় লিখে দেয়। কিন্তু নীতিগতভাবেই এটা এক বিরাট ভুল তাতে সন্দেহ নেই। ত্রিশ-বত্রিশ বছরে রাশিয়ার যাকিছু উন্নতি সাধিত হয়েছে তার সাথে যদি আমেরিকা, জাপান কিংবা জার্মানীর অনুরূপ সময়ের উন্নয়নমূলক কাজের তুলনা করা যায়, তবে সম্ভবত শেষোক্ত দেশসমূহের উন্নতির হার অধিক পরিলক্ষিত হবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে জাপান, শিক্ষা, শিল্প বাণিজ্য, প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার ও ধন উৎপাদন খাতে যাকিছু উন্নতি করেছিল, ১৯০৪ সালে যখন জাপান রাশিয়াকে পরাজিত করেছিল, তখন ঐসব খাতে তার উন্নতি অধিক মাত্রায় বেশী হয়েছিল। ১৮৭০ সালে জার্মানীর যে অবস্থা ছিল, বিংশ শতকের শুরু পর্যন্ত পৌঁছতে তার বাসিন্দাদের বৈজ্ঞানিক ও মানসিক পরিস্থিতি এবং তার অর্থনৈতিক উপায়-উপাদান উৎপাদন হারের দৃষ্টিতে তা কোথায় না পৌঁছেছিল ! এসব উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের অনুরূপ মেয়াদের রুশীয় উন্নয়নের সাথে তুলনা করে দেখলে রাশিয়ার ভাগে গৌরবের কতটুকু অংশ পড়বে ? তাহলে কি এ নীতি মেনে নিতে হবে যে, একটি দেশ এক বিশেষ সময় কিছু অসাধারণ উন্নতি লাভ করে থাকলে তার প্রাপ্য সকল তা'রীফ সেই দেশের জীবনব্যবস্থা, অর্থনীতি ও শাসন পদ্ধতিরও প্রাপ্য হবে ? অথচ অনেক সময় সমাজ জীবনের সমগ্র কার্যকলাপ ভ্রান্ত নীতির উপর চলেও নেতৃবৃন্দের ব্যক্তিগত যোগ্যতা, কর্মক্ষমতা এবং তার সাহায্যকারীদের নিষ্ঠা এ ধরনের বিরাট ফল প্রদর্শন করতে পারে। অনুরূপভাবে কমিউনিস্ট রাশিয়ার যেসব দোষ-ক্রটির বিরুদ্ধে প্রোপাগাণ্ডা করা হয়, তার মধ্যে বহুসংখ্যক এমন আছে যা কমিউনিষ্ট পরাক্রম শাসকদের শাসনকার্যেও পুরামাত্রায় পাওয়া যায়। তাহলে এসব দোষ-ক্রটি খারাপ লোকদের হিসাবে ধরার পরিবর্তে সে দেশের সমাজব্যবস্থা ও অর্থনীতির সাথে যোগ করবে কোন্ কারণে ?

লাভ ঃ অপ্রাসঙ্গিক বিষয়গুলো বাদ দিয়ে রুশীয় কমিউনিজমের বাস্তব অভিজ্ঞতার দৌলতে মূল কমিউনিজমের যে কীর্তি আমাদের সামনে উদ্ভাসিত হয়েছে, তা যাচাই করে দেখলে লাভের খাতে আমরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলো দেখতে পাই ঃ

এক ঃ জমি-খেত, কারখানা ও সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যক্তির হাত থেকে বের করে নেয়ার এ ফল পাওয়া গেছে যে, পণ্যের মূল্য, খরচ ও তার বাজার মূল্যের মাঝখানের মুনাফা যা প্রথমে জমিদার, কারখানা মালিক ও

ব্যবসায়ীদের মধ্যে বণ্টন হয়ে যেতো অতপর সরাসরি সরকারী কোষে সঞ্চিত হতে শুরু হলো। এবং এ মুনাফার টাকা সামগ্রিক কল্যাণকর কাজে ব্যয় করা খুবই সহজসাধ্য হলো।

দুই ঃ সমগ্র দেশের উৎপাদন উপায় এক ব্যবস্থাধীন হওয়ার ফলে একদিকে একটি সুপরিকল্পিত পরিকল্পনা অনুযায়ী তাকে অধিকতর উন্নয়ন ও অপেক্ষাকৃত অধিক কল্যাণমূলক কাজে ব্যবহার করার সুযোগ হয়েছে। অপরদিকে সমগ্র দেশের প্রয়োজনকে সামনে রেখে তা পরিপূরণের সুসংবদ্ধ ব্যবস্থাপনা কার্যকরী করা সম্ভব হয়েছে।

তিন ঃ সমগ্র উৎপাদন উপায় করায়ত্ত করে গভর্নমেন্ট যখন একটি ব্যাপক পরিকল্পনা অনুযায়ী তার পরিচালনা করতে লাগলো, তখন দেশের সকল কর্মোপযোগী ও সক্ষম লোকদেরকে কাজে নিয়োগ করা সম্ভব হলো, উপরন্তু এক সুপরিকল্পিত স্কীম অনুযায়ী শিক্ষা ও ট্রেনিং দিয়ে সামগ্রিক, অর্থব্যবস্থার জরুরী কাজ ও পদের জন্য উপযুক্ত সংখ্যক কর্মী তৈরি করা অধিকতর সহজ হলো।

চার ঃ এক নম্বরে উল্লেখিত কৃষি, শিল্প ও ব্যবসায়ের যে লাভের উল্লেখ করা হয়েছে, তা সরকারের হস্তগত হওয়ার ফলে তার একটি অংশ "স্যোশাল ইন্সিওরেন্স" অর্থ হচ্ছে সারা দেশে যেসব লোক রুযি-রোযগারের কাজ করতে অক্ষম, কিংবা অস্থায়ী বা স্থায়ীভাবে অকর্মণ্য হবে, অথবা রোগজ্বরা, সন্তান প্রসব ও অন্যান্য বহুবিধ অবস্থার কারণে যাদের সাহায্য দান করার প্রয়োজন দেখা দিবে, তাদেরকে সম্মিলিত জাতীয় ফাণ্ড থেকে সাহায্য দান করা।

ক্ষতি ঃ বস্তুত অবাধ অর্থনীতির ফলে সমাজ জীবনে যেসব রোগ দেখা দিয়েছিল, কমিউনিজমের এ অপারেশনের ফলে তার কার্যকরী চিকিৎসা সম্পন্ন হচ্ছে, একথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু রাশিয়াকে তার জন্য কি মূল্য দিতে হয়েছে এবং পূর্ববর্তী রোগ দূর করার ফলে তার স্থলে যে অভিনব রোগ দেখা দিয়েছে তা যাচাই করে দেখলেই তার অন্তঃসারশূন্যতা উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে ঃ

এক ঃ ব্যক্তিদের মালিকানা ও কর্তৃত্ব থেকে জমি-খেত, কারখানা ও অন্যান্য উৎপাদন উপায় কেড়ে নেয়া এবং এসব কিছুকে জাতীয় মালিকানা গণ্য করা—আর যাই হোক কোনো ছেলেখেলা বা হাসি-তামাসার ভিতর দিয়েই সম্পন্ন হতে পারেনি। প্রকৃতপক্ষে এটা অত্যন্ত কঠিন ও দুরূহ কাজ। কয়েক বছর পর্যন্ত ক্রমাগত ও নিরবচ্ছিন্নভাবে মারাত্মক অত্যাচার, নিষ্পেষণ পরিচালনার মাধ্যমে এ কাজ সম্পন্ন হয়েছিল। লক্ষ লক্ষ মানুষের কব্জা

থেকে তাদের ক্ষুদ্র-বৃহৎ সম্পত্তি জোরপূর্বক কেড়ে নেবার সংকল্প করলে তারা যে এর সামনে অতি সহজেই মাথানত করতে প্রস্তুত হবে না, একথা সহজেই বুঝতে পারা যায়। এরূপ যেখানেই এবং যখনই করা হবে, এর জন্য সর্বাত্মক রক্তপাত ও নরহত্যার তাণ্ডবলীলা সৃষ্টি করতে হবে। রাশিয়ায় এ কার্যসম্পাদন করতে গিয়ে বিপ্লবীদেরকে প্রায় ১৯ লক্ষ মানুষকে মৃত্যুর করালগ্রাসে নিক্ষেপ করতে হয়েছে। বিশ লক্ষ মানুষকে নানাবিধ দণ্ড দান করা হয়েছে। এবং চল্লিশ পঞ্চাশ লক্ষ মানুষকে জন্মভূমি থেকে বহিষ্কৃত, নির্বাসিত ও বিক্ষিপ্ত হয়ে দুনিয়ার নানাস্থানে আঘাত খেয়ে মরতে হয়েছে। কেবলমাত্র জাতীয় কৃষি পরিচালনানীতি কার্যকরী করার জন্য কয়েক লক্ষ নিম্ন ও মধ্যবিত্ত জমি মালিক (Kulaks)-কে যেরূপ মর্মান্তিকভাবে ধ্বংস করা হয়েছে, সেজন্য স্বয়ং সমর্থক অনেক ব্যক্তি চীৎকার করে উঠেছে।

দুই ঃ সমগ্র দুনিয়ার সর্ব সমর্থিত, ধর্মীয়, নৈতিক ও আইনগত রীতি-নীতি অনুযায়ী যারাই নিজ নিজ বিত্ত-সম্পত্তির বৈধ মালিক, তাদেরকে যদি বিশেষ কোনো লোক বা লোক সমষ্টির কোনো মনগড়া ও অভিনব পরিকল্পনা কার্যকরী করার জন্য জোরপূর্বক এ মালিকানা থেকে বঞ্চিত ও উচ্ছেদ করার চেষ্টা করা হয়, তাহলে তাদেরকে তাদের মতবাদবিরোধী এ সকল ধর্মীয়, নৈতিক ও তামাদ্দুনিক বিধি-বিধানকেও সুস্পষ্ট ভাষায় অস্বীকার করতে হবে। শুধু তাই নয়, মালিকানা ধ্বংস করার সাথে সাথে সেই ধর্ম ও নৈতিক বিধানসমূহকেও সমূলে উৎপাটনের জন্য নিজেদের সমগ্র শক্তি নিযুক্ত করতে হবে। উপরন্তু নিজেদের এ পরিকল্পনাকে সকল প্রকার নির্মমতা, নিষ্ঠুরতা, যুলুম, মিথ্যা ও প্রতারণার সাহায্যে কার্যকরী করার জন্যও তাদেরকে এক অভিনব নীতি-দর্শন রচনা করতে হবে। যার ভিত্তিতে সকল প্রকার যুলুম, না-ইনসাফী, অত্যাচার, নিষ্পেষণ, নির্মমতা ও কঠোরতা অবলম্বন করা সম্পূর্ণ বিধি সংগত বিবেচিত হবে। ঠিক এ কারণেই কমিউনিষ্ট নেতৃবৃন্দ ও কর্মকর্তাগণ নিজেদের পরিকল্পিত বিপ্লব সম্পন্ন করার জন্য আল্লাহ্ ও ধর্মের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রোপাগাণ্ডা করতে বাধ্য হয়েছে এবং বুর্জোয়া শ্রেণী সাথে সাথে মুসলিম ও খৃস্টান সমাজে ধার্মিক লোকদেরকে কঠোরভাবে উৎপাটন করেছে, চরিত্র ও নৈতিকতা সম্পর্কে এক নূতন মতাদর্শ গড়ে নিতে হয়েছে। লেনিনের ভাষায় এ মতাদর্শটি নিম্নরূপ ঃ

> "আমরা এমন সকল প্রকার নীতিদর্শনকে প্রত্যাহার করি, যা উচ্চতর জগত সম্পর্কীয় কোনো বিশ্বাসের উপর ভিত্তিশীল কিংবা শ্রেণী পার্থক্যজ নিত ধারণা-খেয়ালের পরিপন্থী কোনো চিন্তা থেকে গৃহীত। আমাদের মতে নৈতিক চরিত্র সম্পূর্ণ ও একচ্ছত্রভাবে শ্রেণী সংগ্রামের অধীন। প্রাচীন

মুনাফাবাদী সমাজব্যবস্থাকে নির্মূল করা এবং শ্রমজীবি লোকদেরকে সংঘবদ্ধ করার জন্য যে যে কাজ ও জিনিসই অপরিহার্য বোধ হবে, নৈতিকতার দিক দিয়ে তা সবই সুসংগত এবং বৈধ। নৈতিক চরিত্র বলতে আমরা এতটুকুই বুঝি যে, আমাদের খুব মজবুত ও সুসংবদ্ধ হতে হবে, মুনাফাখোর শ্রেণীর বিরুদ্ধে পূর্ণ চেতনা সহকারে সংগ্রাম করতে হবে। নৈতিক চরিত্রের এমন কোনো নীতি আমরা আদপেই স্বীকার করি না, যা আদিম ও শাশ্বত। আমরা এ প্রবঞ্চনার আবরণ ছিন্ন করেই ক্ষান্ত হবো। মজুরদের নিরংকুশ শাসন ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যুদ্ধ করা ছাড়া কমিউনিস্ট চরিত্র আর কিছুই হতে পারে না।"

"একাজ করার জন্য সকল প্রকার কৌশল-প্রবঞ্চনা, শঠতা, আইন বিরোধী ব্যবস্থাপনা, টালবাহানা ও মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে, এটা একেবারে অপরিহার্য।"

বস্তুত রাশিয়ায় কমিউনিষ্ট সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য দ্বিতীয় পর্যায়ে এ বিরাট মূল্য দান করতে হয়েছিল। অর্থাৎ কেবল এক কোটি মানুষের জীবনই নয়, তার সাথে দীন, ঈমান, নৈতিক চরিত্র, মনুষ্যত্ব-মানবতা ও সম্মান-সম্ভ্রম সবকিছুই এহেন 'আনকোরা' মত ও পরিকল্পনা কার্যকরী করার পথে প্রচণ্ড বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

তিন ঃ আমাদের দেশে আমরা নিজেরাই প্রত্যক্ষ করেছি যে, একদিকে নৈতিক বাঁধন যখন শিথিল হয়ে যায় এবং অপরদিকে বিভিন্ন নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন করে দেয়া হয়, তখন ঘুষ-রিশওয়াত, খিয়ানত-লুণ্ঠন ও প্রতারণার এক সয়লাব গোটা সমাজকে গ্রাস করে ফেলে। নিত্য প্রয়োজনীয় যে জিনিসই পারমিট, লাইসেন্স, রেশনকার্ড কিংবা কোটা লাভের উপর নির্ভরশীল হয়, সেই জিনিসের জন্য জনগণকে নানাবিধ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। সরকারী পদস্থ লোকদের নিকট ধর্ণা দিতে হয়। এমতাবস্থায় অতি সহজেই অনুমান করা যেতে পারে যে, একদিকে যখন সর্বসমর্থিত যাবতীয় নৈতিক রীতিনীতির বুনিয়াদ উৎপাটিত করা হয় এবং লোকদের মনে একথা বদ্ধমূল করে দেয়া হয় যে, উদ্দেশ্য লাভের জন্য যাই দরকারী তাই সত্য, তাই করণীয় এবং দেশের নেতৃবৃন্দ যখন নিজেরাই অমানুষিক যুলুম নিষ্পেষণের সাহায্যে এহেন অভিনব নৈতিকতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে—অপরদিকে নিত্য প্রয়োজনীয় কয়েকটি মাত্র জিনিসই নয় বরং দেশের সমগ্র অর্থ-সম্পদ ও যাবতীয় জীবন-জীবিকা সরকারী

নিয়ন্ত্রণাধীন হয়, সেখানে ঘুষ-রিশওয়াত, বিশ্বাসঘাতকতা, লুণ্ঠন ও মানুষকে জ্বালাতন করার প্রচণ্ড প্লাবন সৃষ্টি হয়, তাতে কোনোই সন্দেহ থাকতে পারে না। একথা কেবল অনুমান করেই বলা হচ্ছে না ; রাশিয়ার লৌহ প্রাচীরের অভ্যন্তর থেকে যেসব খবর ছাটাই-বাছাই হওয়ার পরও বহির্বিশ্বে প্রচারিত হয়ে থাকে, তার মধ্যে একটি গুরুতর খবর এই যে, সেখানকার সরকারী কর্মচারী ও অর্থবিভাগের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পরিচালকবৃন্দ দুর্নীতির এক বিরাট সমস্যার সৃষ্টি করে নিয়েছে। আর রাশিয়ার মত দেশের এরূপ একটি সমস্যার মাথাচাড়া দিয়ে উঠা কোনো বিস্ময়কর ও অভাবিতপূর্ব ঘটনা নয়। এরূপ সংঘটিত না হওয়াই বরং ছিল আশ্চর্যজনক ঘটনা। একটি প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাকে চরিত্রহীনতার আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়া খুবই সহজ, কিন্তু নূতনতর কোনো ব্যবস্থাকে চরিত্রহীনতার ভিত্তিতে সুষ্ঠুভাবে চালিয়ে নেয়া বড়ই কঠিন কাজ। বস্তুত এরূপ একটা ব্যবস্থাকে সুষ্ঠুরূপে পরিচালিত করার জন্য উত্তম ও সুদৃঢ় চরিত্র বিশিষ্ট মানুষের প্রয়োজন। কিন্তু সেখানে পূর্বেই তার মূলোৎপাটন করা হয়েছে।

চার ঃ ব্যক্তিগত মালিকানা খতম করে সামাজিক ও জাতীয় মালিকানার ভিত্তিতে দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সুষ্ঠু ও সাফল্যজনকভাবে চালাবার জন্য সর্বপ্রথম কতগুলো কাজ করে নেয়া অপরিহার্য। সেজন্য লোকদের মন-মগজ থেকে স্বার্থপরতা ও ব্যক্তিগত মুনাফা লুণ্ঠনের লিপ্সা দূরীভূত করা আবশ্যক। এবং ঐসব ভাবধারার পরিবর্তে তাদের মন-মগজের মধ্যে সামগ্রিক কল্যাণের জন্য কাজ করার প্রবণতাকে অত্যন্ত প্রবল করে দিতে হবে এতদূর প্রবল যে, তাই হবে তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রধান কর্মপ্রেরণার উৎস। কমিউনিষ্টদের দাবী ছিল যে, মানবপ্রকৃতি, স্বভাব ও উত্তরাধিকারমূলক ঝোঁকপ্রবণতা নিছক বুর্জোয়া দর্শন ও বিজ্ঞানের প্রবঞ্চনা মাত্র। প্রকৃতপক্ষে এ নামের কোনো বস্তুই বর্তমান নেই। আমরা ব্যক্তিগত মুনাফা, লাভ স্বার্থপরতামূলক ভাবধারা মানুষের মধ্য থেকে বহিষ্কৃত ও দূরীভূত করে দিবো এবং পরিবেশের পরিবর্তন দ্বারা সামগ্রিক ও জাতীয় মানসিকতার সৃষ্টি করে নিবো। কিন্তু এ অমূলক দাবীকে বাস্তবায়িত করার ব্যাপারে কমিউনিষ্টগণ মর্মান্তিকভাবে ব্যর্থ হয়েছে। প্রত্যেক দেশের জনগণের মধ্যে সামগ্রিক মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি স্বভাবত যতখানি বর্তমান থাকে, কমিউনিষ্টগণ তাদের দেশের জনগণ এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে তার তুলনায় এ জিনিস একবিন্দু পরিমাণও বৃদ্ধি করতে পারেনি। জনগণ ও কর্মচারীদের মধ্য থেকে স্বার্থপরতা ও মুনাফা লিপ্সাকে দূরীভূত করে

দেয়া তো দূরের কথা, তার মাত্রা একবিন্দু কমও করতে পারেনি। বরং তারা ক্লান্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত তাকে সোজাসুজি স্বীকৃতি দিতে এবং লোকের দ্বারা কাজ আদায় করার জন্য তাদের স্বার্থপরতাকেই উদ্বুদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছে। এ পর্যন্ত তো তারা বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থার সমান পর্যায়ে রয়েছে। কিন্তু যে জিনিস তাদেরকে বুর্জোয়া সমাজ থেকেও অধিক বিপর্যয়ে নিক্ষেপ করেছে তা এই যে, তারা যখন জনগণের ব্যক্তিগত মুনাফা লিপ্সার চরিতার্থতা বিধানের জন্য কৃষি, শিল্প-ব্যবসায় ও অন্যান্য লাভজনক কারবারের স্বাভাবিক পথ বন্ধ করে দিল এবং কৃত্রিম প্রচারণার সাহায্যে এ মুনাফা লিপ্সার সহজ ও যুক্তিসঙ্গত অভিব্যক্তিকে শুধু শুধুই এবং জোরপূর্বক দূষণীয় ঘোষণা করলো তখন এ ভাবধারা মনের গহ্বরে তলিয়ে গেল এবং মানুষের অপরাপর পুঞ্জীভূত ভাবধারার ন্যায় তাও বিপদগামী (Pervert) হয়ে বাইরে আত্মপ্রকাশ লাভের জন্য এমন ভুল পথ অবলম্বন করলো যে, তা ভিতর থেকেই সমাজের বুনিয়াদে ঘুণ ধরিয়ে দিলো, তাকে অন্তঃসারশূন্য করে দিলো। কমিউনিষ্ট সমাজে ঘুষ-রিশওয়াত, বিশ্বাসঘাতকতা, চুরি, অপরহণ, লুণ্ঠন ও এ ধরনের আরো বহুবিধ মারাত্মক দোষ-ক্রুটির বৃদ্ধি ও প্রাধান্য লাভের মূলে এ জিনিসের অপরিসীম প্রভাব বিদ্যমান। কমিউনিষ্ট সমাজে কেবল একটিমাত্র জিনিসই নিষিদ্ধ এবং তা এই যে, সেখানে কোনো ব্যক্তি নিজস্ব উপার্জিত ধন-ঐশ্বর্য অধিক ধন লাভ ও উৎপাদনমূলক কোনো কাজে নিয়োগ করতে পারে না। এছাড়া ধন-সম্পদের আর সকল প্রকার ব্যবহারের ক্ষেত্রই সেখানে অবাধ উন্মুক্ত রয়েছে, যেমন রয়েছে দুনিয়ার অন্যান্য সমাজে। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজস্ব পোশাক, খাদ্য, ঘরবাড়ী, যানবাহন, ফার্নিচার ও বিলাশ ব্যাসনের সকল রকম দ্রব্য সামগ্রী ক্রয়ে যত ইচ্ছা অর্থ খরচ করতে পারে। নিজেদের জীবনযাত্রার মান যতদূর ইচ্ছা উঁচু করে তুলতে পারে। এমনকি, পাশ্চাত্য সমাজে বিলাশ-ব্যাসন, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও স্ফূর্তি-লালসা চরিতার্থ করার যত উপায়ই অবলম্বিত হতে পারে, কমিউনিষ্ট সমাজেও তাই অবাধ নীতিতে অবলিম্বত হতে পারে। এরপরও যত পরিমাণ অর্থ উদ্বৃত্ত থাকে তা সবই তারা সঞ্চয় করে রাখতে পারে। এ পুঞ্জীকৃত অর্থ (সরাসরিভাবে নিজে না পারলেও) সরকারী ব্যবস্থার মাধ্যমে লাভজনক কাজে লগ্নি করতে পারে এবং তাতে শতকরা আট-দশ টাকা হারে পর্যন্ত বার্ষিক সুদ গ্রহণ করতে পারে। আর এ সঞ্চিত ধন-সম্পদ নিজের উত্তরাধিকারীদের জন্য রেখে মরতেও পারে।

পাঁচ ঃ এত ব্যাপক আকারে রক্তপাত, ভাঙ্গাচুরা এবং দীন, চরিত্র ও মানবতার এ মর্মান্তিক ধ্বংস ও বিপর্যয় কেবল একটি উদ্দেশ্যেই বরদাশত করা হয়েছিল। তা ছিল এই যে, পণ্যের উৎপাদন ও মূল্যে তার বিক্রয় মূল্যের

মধ্যবর্তী মুনাফা (Surplas value) কেবল জমিদার, কারখানা মালিক ও ব্যবসায়ী শ্রেণীর লোকেরাই লুটে নেয়, তা মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোকেরই পকেটস্থ না হয়ে যেন সমাজের সামগ্রিক ভাণ্ডারে সঞ্চিত হয়। এবং এখান থেকে যেন তা পূর্ণ সাম্য ও ইনসাফ সহকারে সকলের মধ্যে বন্টন হতে পারে। ব্যক্তিগত মালিকানা খতম করার উদ্দেশ্যও এটাই ছিল। আর এটা যদি বাস্তবিকই লাভ করা সম্ভব হতো, তাহলে একে সামগ্রিক ও জাতীয় মালিকানার বড় ফায়দা মনে করা যেতে পারতো। কিন্তু এ উদ্দেশ্য কি বাস্তবিকই সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে ? ব্যক্তিগত মালিকানা খতম করে দিলে কৃষি, শিল্প ও ব্যবসায়ের যে মুনাফা জাতীয় ভাণ্ডারে সঞ্চিত হচ্ছে, তা কিভাবে বণ্টিত হচ্ছে, তাই একবার পরীক্ষা করে দেখুন না।

রুশ সরকারের সমগ্র বিভাগে ও অর্থনৈতিক কাজ-কারবারে সকল প্রতিষ্ঠানের নিম্নস্তরের কর্মচারীর ও উচ্চ পদস্ত অফিসারদের বেতনের মধ্যে যে কোনো বুর্জোয়া সমাজের মতোই আসমান-যমীন পার্থক্য বিদ্যমান। এদিকে সাধারণ কর্মচারীদের বেতন ও জীবনযাত্রার মান আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ডের মজুর-শ্রমিকদের তুলনায় অবাঞ্ছনীয়রূপে নিম্নস্তরের। ভারত ও পাকিস্তানের মজুরদের তুলনায় তাদের অবস্থা কিছুটা উন্নত হলেও খুব বেশী উচ্চ যে নয়, তা নিসন্দেহ। অপরদিকে ডিরেক্টর, ম্যানেজার, সরকারী অফিসার, সামরিক কর্মকর্তা, অভিনেতা-অভিনেত্রী এবং গ্রন্থ প্রণেতা ও সংকলক প্রমুখদের আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে বার্ষিক কয়েক লক্ষ 'রুবল' পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে। ফলে পূর্ণমাত্রায় না হলেও এ ব্যবসায় ও শিল্পের মুনাফা উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে অত্যন্ত অসমানভাবে বণ্টিত হচ্ছে। আর হচ্ছে ঠিক সেভাবে, যেভাবে শ্রমজীবি ও বুর্জোয়াদের মধ্যে বণ্টিত হতো প্রাক-বিপ্লব যুগে।

পরন্তু কমিউনিষ্ট বিপ্লব সৃষ্টির উদ্দেশ্যে শ্রমজীবি জনগণ ও বুর্জোয়াদের মধ্যে যে ঘৃণা-বিদ্বেষ ও প্রতিশোধমূলক সর্বাত্মক আক্রোশের আগুন প্রজ্জ্বলিত করা হয়েছে, তা গোটা পৃথিবীর অকমিউনিষ্ট সমাজ ও জনগণকে রুশ বিরোধী বানিয়ে দিয়েছে। এ কারণে রাশিয়া ব্যক্তিগত মালিকানা খতম করে ব্যবসায় ও শিল্পোৎপাদনের মুনাফা বুর্জোয়াদের মধ্যে বণ্টন না করে সরকারী কোষে সঞ্চিত করে রাখতে এবং তার একটি বিরাট অংশ সামরিক প্রস্তুতির উদ্দেশ্যে নিয়োগ করতে বাধ্য হয়েছে।

এ দুটি বড় বড় খাতে ব্যয়িত হওয়ার পর জাতীয় মুনাফার যত অংশ শ্রমজীবিদের ভাগে পড়েছে, শুধু তাই 'সোশ্যাল ইন্সিওরেন্স'-এর কাজে

বিনিয়োগ হতে পারে মাত্র। কিন্তু মোট মুনাফার তুলনায় তার হার কত ? খুব বেশী বাড়িয়ে বললেও শতকরা এক কিংবা দু' ভাগের বেশী কিছুতেই হবে না।[১]

কিন্তু প্রশ্ন এই যে, এতটুকু পরিমাণ কিংবা এটা অপেক্ষাও অনেক বেশী পরিমাণ অর্থ যদি অন্য কোনো উপায়ে সামগ্রিক কল্যাণার্থে ব্যয় করার জন্য পাওয়া যায়, তাহলে রুশ বিপ্লবের ন্যায় সর্বাত্মক যুলুম-অত্যাচার, নির্যাতন নিষ্পেষণ এবং দীন ও নৈতিকতার সাথে ব্যক্তিগত মালিকানা খতম করারও শুধু শুধুই জাতীয় মালিকানা ভিত্তিক এক কৃত্রিম সমাজব্যবস্থা নিরীহ জনগণের উপর চাপিয়ে দেয়ার প্রয়োজনীয়তা এবং যৌক্তিকতাই বা কি থাকতে পারে ?

ছয় ঃ জাতীয় মালিকানা, সামরিক শাসন-শৃংখলা ও জাতীয় পরিকল্পনা চালু করার জন্য জান-মাল, ধর্ম ও নৈতিকতা তথা মনুষ্যত্ব ধ্বংসের যে তাণ্ডব রাশিয়ায় অনুষ্ঠিত হয়েছে, তাতো শুধু এ অভিজ্ঞতার প্রাথমিক মূল্য মাত্র। কিন্তু বর্তমানে তা কার্যকরী হওয়ার পর জনগণের দৈনন্দিন জীবনে তার কল্যাণকারিতা কি এবং তার বিনিময়েই বা তাদের নিকট থেকে কতটুকু মূল্য গ্রহণ করা হয়েছে, এরও একটি তুলনামূলক আলোচনা পেশ করা আবশ্যক।

রাশিয়ার বর্তমান সামগ্রিক ব্যবস্থা জনগণকে যাকিছু দিচ্ছে, তার যাচাই করে দেখলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো পাওয়া যাবে ঃ

প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য রোজগারের অন্তত এতটুকু ব্যবস্থা করা হয়েছে, যার দ্বারা তারা দু' বেলার খাবার ও দেহাবরণ পরিমাণ কাপড় এবং মাথা গুজার ঠাঁই কতকটা লাভ করতে পারে। দুঃসময়ে ব্যক্তির জন্য আশ্রয়ের ব্যবস্থা হওয়ার সামাজিক সুবিধাটুকুও লাভ হয়েছে।

রাশিয়ার এ নবতর ব্যবস্থা দেশবাসীকে মূলত এ দুটি জিনিসই দান করেছে, এর অধিক কিছু নয়।

এখন দেখতে হবে যে, এর বিনিময়ে রাশিয়া জনগণের নিকট থেকে কতখানি এবং কি জিনিস গ্রহণ করেছে।

---

১. রাশিয়ায় 'সোশ্যাল ইন্সিওরেন্স'-এর ফাণ্ড সংগ্রহ করার পদ্ধতি এ প্রত্যেক বিভাগে সর্বসাকুল্যে কর্মচারীদের বেতন বাবদ যত টাকা ব্যয় করা হয়, তার শতকরা দশ ভাগ থেকে বিশ ভাগ পর্যন্ত এক বিশেষ নিয়মে 'সোশ্যাল ইন্সিওরেন্স' পরিকল্পনা হিসেবে জমা করে দেয়া হয়। এভাবে সমগ্র দেশের বেতন ও মজুরীর মোট পরিমাণের শতকরা চৌদ্দ ভাগ কর্মচারীদের সামগ্রিক কল্যাণের জন্য ব্যয় করা হয়। আর এটা সমগ্র আর্থিক মুনাফার শতকরা, এক কিংবা দুই ভাগ হয় মাত্র।

ব্যক্তিগত মালিকানার পরিবর্তে জাতীয় মালিকানা ব্যবস্থা কার্যকরী করার জন্য এ আদর্শের ধারক কমিউনিষ্ট পার্টির হাতে অনিবার্যরূপে দেশের সমগ্র ক্ষমতা অর্পণ করতে হয়েছে। এ দলের মতাদর্শ ও এ অনিবার্য দাবীর ফলে দেশের উপর এক সর্বাধিনায়ক ডিকটেটরী শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সমগ্র ক্ষমতা প্রয়োগ করে এ দলকে ব্যক্তিগত মালিকানা ব্যবস্থা চূর্ণ করতে এবং অমোঘ হাতের লৌহ দাপটে নূতন ব্যবস্থা চালু করতে হয়েছে। এ ডিকটেটরী শাসনের নামকরণ করা হয়েছে কর্মচারীদের ডিকটেটরশীপ (Dictatoship of the prolatariat); কিন্তু একথা সর্বজনবিদিত যে, রাশিয়ার মজুর-শ্রমিক, কৃষক এবং সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ও বিভাগের সমগ্র কর্মচারী কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্যভুক্ত নয়। রুশ জনগণের মধ্যে সম্ভবত শতকরা ৫ জন লোক পার্টির সদস্যভুক্ত হতে পারে তার বেশী নয়। কাজেই বাহ্যত তাকে 'মজুরদের ডিকটেটরশীপ' বলা হলেও প্রকৃতপক্ষে তা শ্রমিক-মজুরের উপর চাপিয়ে দেয়া কমিউনিষ্ট পার্টির ডিকটেটরশীপ মাত্র।

আর এ ডিকটেটরী শাসন কোনো হালকা ধরনের জিনিস নয়। জাতীয় মালিকানা কায়েম হওয়ার অর্থ এটাই দাঁড়ায় যে, সেখানে সকল জমিদার খতম করে দেয়া হয়েছে এবং সরকার একক ও লা-শরীক জমিদাররূপে দেশের সমগ্র জমি-খেতের একচ্ছত্র মালিক হয়ে রয়েছে। কারখানা মালিক ও ব্যবসায় পুঁজিপতি হিসাবে সেখানে এখন আর কোনো ব্যক্তি নেই, এ সকলকে উৎখাত করে দিয়ে সকলের স্থান দখল করে বসেছে এমন এক পুঁজিদার যার নিরঙ্কুশ একাধিকারভুক্ত হয়েছে উৎপাদন-উপায়ের সকল দিক ও রূপ। সেই সাথে সাথে সমগ্র দেশের রাষ্ট্রশক্তিও তার একনায়কত্বে কেন্দ্রীভূত হয়েছে। রাশিয়ার কমিউনিষ্ট পার্টির বাস্তবরূপ এটাই।

এখন যদি দেখতে পাওয়া যায় যে, রাশিয়ার সমগ্র আর্থিক, তামাদ্দুনিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা যারা ব্যবহার করছে, তারা দেশের সাধারণ লোকদের ভোটেই নির্বাচিত, তবে একে কি বাস্তবিকই গণতন্ত্র বলে অভিহিত করা যায়? কমিউনিষ্ট পার্টির সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার দুঃসাহস করলেও রাশিয়ার মত বিরাট দেশে খাদ্য ও আশ্রয় গ্রহণের কোনো উপায় কি তার হবে? তার সরকার বিরোধী কথা প্রচার করার জন্য সে কোনো প্রেস ব্যবহার করতে পারবে কি? ... স্বীয় কথা জনগণের নিকট পৌছানোর জন্য সে কোনো যানবাহনে চড়ে দেশ ভ্রমণ, জীবন ও মৃত্যুর মধ্যবর্তী দূরত্বটুকু অতিক্রম করতে তার কতটুকু সময় লাগবে?

আসল কথা এই যে, জাতীয় মালিকানা ব্যবস্থায় সরকারের হাতে এত অধিক মাত্রায় ক্ষমতা পুঞ্জীভূত হয়ে যায়, যা মানবেতিহাসের কোনো এক

অধ্যায়েই কারো করায়ত্ব হয়নি। কোনো চেংগীস খাঁ, হালাকু খাঁ, জার ও কাইযাে. হাতেও এতদূর ক্ষমতা কখনো একত্রিত হয়নি। বস্তুত যে দলই একবার এরূপ ক্ষমতা দখল করে বসতে পারে, তার সামনে দেশের কোটি কোটি জনগণও অত্যন্ত অসহায় হয়ে যায়। দুনিয়ার যে কোনো খারাপ সরকারের পরিবর্তন এত কঠিন ও দুঃসাধ্য নয়, যতদূর দুঃসাধ্য বা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায় একটি কমিউনিষ্ট সরকার পরিবর্তন করা।

এরূপ শাসন ব্যবস্থায় ক্ষমতাসীন দল দেশের সামগ্রিক জীবনের জন্য যে পরিকল্পনা ও কর্মসূচী (Plan) গ্রহণ করে, তাকে সুষ্ঠুরূপে পরিচালিত ও কার্যকরী করার জন্য প্রেস, রেডিও, সিনেমা, শিক্ষাগার তথা সমগ্র শাসনযন্ত্রকে (Administrative Machinary) এবং সারা দেশের অর্থনৈতিক কাজ কারবারকে এক বিশেষ পদ্ধতিতে ব্যবহার করে। এরূপ পরিকল্পনাকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য সারা দেশের মধ্যে চিন্তা করার, রায় বের করার ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার অধিকার একচ্ছত্রভাবে থাকতে হবে সেই মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্যক্তির, যারা কেন্দ্রীয় শাসনযন্ত্রের শীর্ষদেশে বসে পরিকল্পনা রচনা করে। তাদের ছাড়া দেশের কোটি কোটি সাধারণ লোক হবে শুধু তাদের নির্দেশানুযায়ী কাজ করার হাত-পা মাত্র, যারা হুকুম পালন করতে বিন্দুমাত্র ত্রুটি করতে পারবে না। সমালোচনা ও দোষ ধরা এবং বিপরীত রায় জাহির করে এমন লোকদের জন্য এরূপ ব্যবস্থায় জেলখানা ও ফাঁসিকাষ্ঠ ছাড়া আর কোনো স্থানই থাকতে পারে না। এরূপ সমালোচনাকারী ব্যক্তিকে যদি নির্বাসিত করা হয়, তাহলে বুঝতে হবে যে, তার প্রতি বড়ই অনুগ্রহ প্রদর্শন করা হয়েছে। ঠিক এ কারণেই রাশিয়ার স্বয়ং কমিউনিষ্ট পাটির বড় বড় নেতৃস্থানীয় কর্মী ও কর্মকর্তাকেও মৃত্যুদণ্ড, যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে। অথচ তাদেরই অকৃত্রিম চেষ্টা-সাধনা, যোগ্যতা-কর্মক্ষমতা ও আত্মত্যাগের ফলেই একদিন কমিউনিজমের এ অভিজ্ঞতা-প্রচেষ্টা সফলতার পথে অগ্রসর হয়েছিল। কিন্তু এতদসত্ত্বেও কেবলমাত্র ক্ষমতাসীন দলের সাথে মতদ্বৈততা করার দুঃসাহস তাদেরকে এরূপ পরিণতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

শুধু তাই নয়, মতবৈষম্য জাহির করার অপরাধে যাকেই গ্রেফতার করা হয়েছে, তারই বিরুদ্ধে কঠিন ও সাংঘাতিক রকমের কাজের অভিযোগ আনয়ন করা হয়েছে। কমিউনিষ্ট আদালতের সামনে ক্ষমতাসীন দল কর্তৃক আনীত অভিযোগ অনুসারে প্রত্যেক অভিযুক্ত ব্যক্তি স্বীয় অপরাধের ফিরিস্তি নিজেই 'ফর ফর' করে শুনিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছে এবং এ ফিরিস্তি অস্ফুট শব্দে শুনায়নি,

সুস্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করেছে যে, সে মস্তবড় দেশদ্রোহী ও পুঁজিবাদিদের এজেন্ট এবং রাশিয়ার অভ্যন্তরে লালিত পালিত বিষধর সাপ। এ সমস্ত ব্যাপারটি একদিকে যেমন কমিউনিষ্ট নৈতিকতার কদর্য ও জঘন্য রূপ প্রদর্শন করে অপরদিকে তেমনি কমিউনিষ্ট আদালতের বিস্ময়কর কেরামতী দেখে বিশ্ববাসী হতচকিত না হয়েও পারে না।

দ্বিতীয়তঃ যেহেতু ব্যক্তিগত মালিকানা উচ্ছেদ ও ধর্মীয় দলসমূহকে প্রচণ্ড শক্তিতে দমন করার পরই কমিউনিষ্ট ব্যবস্থা কায়েম করা হয়েছে। এখনো সেইসব লোক দুনিয়া তথা রাশিয়ার বুক থেকে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল হয়ে যায়নি, যাদের অনুভূতি বিশ্বাস ও আশা-আকাংখার সমাধির উপর এহেন কমিউনিষ্ট প্রাসাদ নির্মিত হয়েছে ; এ কারণে কমিউনিষ্ট ডিকটেটরী সরকার প্রতিটি মুহূর্তে প্রতিবিপ্লবের (Counter Revolution) বিপদের আশংকায় আতংকিত হয়ে থাকে ; উপরন্তু কমিউনিষ্ট কর্মকর্তাগণ ভাল করেই জানে ও বুঝে যে, তারা হাজার অস্বীকার করলেও মানুষের প্রকৃতি ও স্বভাব বলতে একটি জিনিসের অস্তিত্ব রয়েছে এবং তা ব্যক্তিগত মুনাফা লাভের সুস্পষ্ট দাবী জানাচ্ছে। ব্যক্তিগত মালিকানার ভিত্তিতে সমাজব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রবলভাবে চেষ্টিত রয়েছে। এসব কারণে কমিউনিষ্ট পার্টি নিজেই একদিকে স্বীয় ব্যবস্থাকে প্রতিনিয়ত 'জুলাব' দিতে ব্যস্ত হয়ে থাকে এবং যাদের মধ্যে পূর্ব ব্যবস্থার প্রতি এক বিন্দু অনুরাগ বা সংস্কারের গন্ধ পাওয়া যায় তাদেরকেও সবসময়ই ধোলাই করতে থাকে।[১] এবং অপরদিকে দলীয় সরকার সমগ্র দেশে প্রতিবিপ্লবের বিপদ সম্ভাবনা সন্দেহ ও দূরতম ধারণার রেশটুকুকেও চিরতরে নির্মূল করার জন্য প্রতিনিয়ত কর্মব্যস্ত হয়ে রয়েছে। এ সরকার সমগ্র দেশে সেপাই ও গুপ্ত পুলিশের এক ব্যাপক বিশাল জাল বিস্তার করে রেখেছে। তার অসংখ্য কর্মচারী প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে, প্রতিটি ঘরে ও পরিবারে, প্রত্যেক জন-সমাবেশে, প্রগতি বিরোধীদের গন্ধ খুঁজে বেড়ায়। গুপ্ত পুলিশের এ অদৃশ্য ও রহস্যময় জাল স্বামী-

১. এ ধোলাই কার্য এখন পর্যন্ত কমিউনিষ্ট পার্টির কয়েক লক্ষ সদস্যের উপর সম্পন্ন করা হয়েছে। রাশিয়ায় এ কাজের অর্থ কেবল এতটুকুই নয় যে, কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য পদের জন্য অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে সদস্য পদ থেকে বঞ্চিত করেই রেহাই দেয়া হয়, বরং এ কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর খুব কম সৌভাগ্যবান ব্যক্তিই রাশিয়ার গুপ্ত পুলিশের আযাবখানায় (Torture Chambers) যাওয়ার আযাব থেকে রক্ষা পেয়েছে। এ আযাবখানা থেকে বের হওয়ার পথ হয় কবরস্থানের দিকে চলে গেছে, নয়তো বাধ্যতামূলক দাস ক্যাম্পের (Concentration Camps) দিকে গেছে। যেখানে মানুষ জীবন্ত অবস্থায় জাহান্নামের আযাবই ভোগ করতে বাধ্য হয়।

স্ত্রীদের মধ্যেও সন্দেহ ও সংশয়ের প্রাচীর দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। এমন কি পিতা-মাতার বিরুদ্ধে স্বয়ং তাদেরই সন্তানগণ পর্যন্ত গুপ্ত পুলিশের দায়িত্ব পালন করতে কুণ্ঠিত হয় না। রাশিয়ার পুলিশ ও সিআইডি'র সুপরিকল্পিত ও সুবিবেচিত (?) মত এই যে, ভুল-ভ্রান্তির কারণে কয়েক শত কিংবা কয়েক সহস্র নিরপরাধ ব্যক্তি যদি ধৃত ও নিহত হয় তবে তা কয়েকজন দোষী-অপরাধী ব্যক্তির নিষ্কৃতি পাওয়া ও তাদের হাতে প্রতিবিপ্লব সৃষ্টির পথ সুগম হওয়া অপেক্ষা অধিকতর উত্তম। এ কারণেই তারা কারখানা ফ্যাক্টরী, প্রত্যেক অফিস ও প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানে খোঁজ করে বেড়ায় ঃ কোনো মজুর কিংবা কর্মী দেশের বা নিজেদের বিভাগের ব্যবস্থাপনাকে অপসন্দ করে, অথবা কোনো প্রকার অস্বস্থি-অতৃপ্তি প্রকাশ করে, এ ধরনের কোনো কাজ বাস্তবিকই করা তো দূরের কথা এই প্রকার চিন্তা করে বলেই কারো সম্পর্কে সন্দেহ পর্যন্ত হলেও তাকে স্বাভাবিকভাবেই গ্রেফতার করে নেয়া হয়। এরূপ ঘটনা যেহেতু নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার কাজেই কোনো কর্মী যখন রাতের বেলা নিজ ঘরে প্রত্যাবর্তন করে না, তখন তার স্ত্রী স্বাভাবিকভাবেই বুঝে নেয় যে, সে গ্রেফতার হয়েছে। পরের দিন তার (স্বামীর) প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো নিজ থেকে পুলিশ অফিসে পৌঁছে দিতে শুরু করে এবং এ দ্রব্যাদি গ্রহণ করার অর্থ এই হয় যে, সে যা ধারণা করেছিল, তাই ঠিক। সে কিছু জিজ্ঞেস করলে অবশ্য অফিসের তরফ থেকে তাকে কোনো উত্তরই দেয়া হয় না। কোনো কোনো দিন এমনও হয় যে, তার প্রেরিত দ্রব্যাদি ফিরে আসে আর এরূপ ঘটলেই বুঝতে হয় যে, তার স্বামী "মহান লেনিনের" জন্য উৎসর্গীত হয়ে গেছে। এখন সেই মেয়েলোকটি নিজেও যদি অনুরূপ পরিণামের সম্মুখীন হতে না চায়, তাহলে একজন নির্ভরযোগ্য কমরেড এর মতো সম্পূর্ণ নির্বাক হয়ে দিন কাটাতে শুরু করা এবং এ প্রসঙ্গে মুখে টু শব্দ না করাই তার কর্তব্য এবং এমন একজন স্বামী খোঁজ করে নেয়াও তার উচিত যার সম্পর্কে 'প্রতিক্রিয়াশীল' হওয়ার কোনো সন্দেহ পোষণ করা হয় না।

বস্তুত দুই বেলাকার খাবার ও অসময়ের নিরাপত্তা লাভের বিনিময়ে এ বিরাট মূল্য দিতেই হয়েছে কমিউনিষ্ট রাশিয়ার কোটি কোটি অধিবাসীকে। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, এ মূল্যের বিনিময়ে এ সওদা কি খুব সস্তা বলা যেতে পারে ? একথা সত্য যে, একজন ক্ষুধাতুর ব্যক্তি অনেক সময়ে ক্ষুধার তীব্র আঘাতে এতই কাবু হয়ে যায়—পরাজয় মানে যে, সে স্বীয় দুঃখ ভারাক্রান্ত স্বাধীনতার অপেক্ষা কারাজীবনকেই অধিক পসন্দ করে থাকে। কেবল এজন্য

যে সেখানে অন্তত দুই বেলা খাবার, দেহাবরণ ও থাকার মত আশ্রয় তো জুটবে। কিন্তু এখন কি গোটা মানবজাতির সামনে এরূপ কোনো সমস্যা দেখা দিয়েছে যে, খাদ্য ও আযাদী—এ দুটি এক সাথে সে লাভ করতে পারে না ? সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠকেই জেলখানায় পরিণত করা এবং কয়েকজন কমরেডকে তার 'জেলার' ও দ্বাররক্ষী নিযুক্ত করাই কি বর্তমান সময় খাদ্য লাভের একমাত্র ও সর্বশেষ উপায় ?

❐

প্রতিক্রিয়া

কমিউনিজম স্বীয় আদর্শের ভিত্তিতে রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম করার জন্য যত বড় আকারে যত বড় অত্যাচার ও যুলুমের অনুষ্ঠান করেছে এবং এ সাফল্য দুনিয়ার প্রত্যেকটি দেশে শ্রেণী সংগ্রামের জ্বলন্ত অগ্নিশিখায় যে তেল সেচন করেছে, তাতে সকল অ-কমিউনিষ্ট দেশের চিন্তাবিদগণ নূতন চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হতে বাধ্য হয়েছেন। অবাধ অর্থব্যবস্থায় নিয়ম-নীতির সংশোধন করে শ্রমজীবিদের অভাব অভিযোগ দূরীভূত করা এবং তাদের দেশকে কমিউনিষ্ট বিপ্লবের বিপদ থেকে মুক্ত করার পন্থা উদ্ভাবনে তারা আত্মনিয়োগ করেছেন। যদিও অবাধ অর্থব্যবস্থার ভিতরকার যাবতীয় দোষ-ত্রুটি নির্দেশ করা হচ্ছিল, সবসময়ই তার সমালোচনা ও দোষ-ত্রুটি আধুনিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থা কায়েম হওয়ার সময়ই সুস্পষ্ট ও প্রকট হয়ে উঠেছিল, সবসময়ই তার সমালোচনা ও দোষ-ত্রুটি নির্দেশ করা হচ্ছিল, তার বাহ্যিক, স্থুল ও আংশিক সংশোধনও কিছু না কিছু হচ্ছিল ; কিন্তু পরিবর্তন ও সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা প্রকৃতপক্ষে রুশীয় কমিউনিজমের কর্মতৎপরতা, প্রভাব ও ফলাফল প্রত্যক্ষ করার পরই অনুভূত হয়েছিল। এ প্রতিক্রিয়া পুঁজিবাদী ব্যবস্থার দুটি বড় বড় এলাকায় দুটি পরস্পর বিপরীত রূপ পরিগ্রহ করে।

প্রথম মহাযুদ্ধের করাল আঘাত যেসব জাতির গোটা জীবনগ্রন্থিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছিল, কমিউনিজমের সংক্ষিপ্ত শ্রেণীসংগ্রামে যাদের চূড়ান্তভাবে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার বিপদ ঘনীভূত হয়েছিল এবং যেসব দেশে গণতন্ত্র সুদৃঢ়ভাবে শিকড় গেড়ে বসতে পারেনি, সেসব দেশে ফ্যাসিবাদ ও নাৎসীবাদের জন্ম হয়।

আর যেসব জাতির মধ্যে গণতন্ত্র সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং যুদ্ধ যাদের জীবনব্যবস্থায় বিশেষ কোনো বিপর্যয় সৃষ্টি করতে পারেনি, তারা নিজেদের প্রাচীন উদার উন্মুক্ত গণতান্ত্রিক পুঁজিবাদকে তার আদর্শিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত রেখে শুধু তার অবাধ ও শর্তহীনতায় এমন কিছু সংশোধন সম্পন্ন করার চেষ্টা করেছে, যার ফলে তার ক্ষতির সম্ভাবনা দূর হয়ে গেছে।

ফ্যাসিবাদ ও নাৎসীবাদ

কমিউনিষ্টগণ সাধারণত ইটালীয় ফ্যাসীবাদ ও জার্মানীর নাৎসীবাদ আন্দোলনকে পুঁজিবাদীদের প্রতিক্রিয়া বলে দোষারোপ করতে চেষ্টা করে।

তারা এ অভিযোগ তুলেছে যে, বুর্জোয়া পুঁজিবাদীগণ সংগ্রামে হেরে যাওয়ার আশংকাবোধ করে হিটলার ও মুসোলিনীকে দাঁড় করিয়েছিল। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার এই যে, এরা বিশেষ কোনো শ্রেণীর বিশেষ কোনো স্বার্থের অসদুদ্দেশ্য সম্পন্ন এজেন্ট ছিল না। তারাও মার্কস ও লেলিনেরই মত এক বিশেষ আদর্শের ধারক ছিল। তাদেরই মত নিষ্ঠাবান, মেধাসম্পন্ন এবং তাদেরই মত বাঁকা বুদ্ধির লোক ছিল। তারা দেখলো একদিকে যুদ্ধের মর্মান্তিক ও সর্বগ্রাসী আঘাত তাদের জাতিকে এতদূর পর্যুদস্ত করে দিয়েছে যে, কয়েকশত বছরের যাবতীয় গৌরব ও মর্যাদা ধূলায় লুণ্ঠিত করে দিয়েছে। অপরদিকে অবাধ অর্থব্যবস্থার আভ্যন্তরীণ দোষ-ত্রুটি এবং কমিউনিজমের বাহ্যিক চাকচিক্য জাতির বিভিন্ন মতের লোকদেরকে পারস্পরিক কঠিন রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ও মারাত্মক দ্বন্দ্বে নিমজ্জিত করে দিতে উদ্যত হয়েছে। এ কারণে তারা শ্রেণী স্বার্থের অন্তর্হিত দ্বন্দ্ব খতম করে স্বীয় জাতীয় ঐক্যকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য কার্যকরী পন্থা উদ্ভাবনে আত্মনিয়োগ করে। সেই সাথে নিজ নিজ জাতির অর্থনৈতিক, তামাদ্দুনিক ও রাজনৈতিক শক্তিকে দৃঢ় করে তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রাধান্য নূতনভাবে স্থাপন করার চেষ্টায় লেগে যায়। কিন্তু তারা এবং তাদের সমর্থক ও অনুসারীগণ সকলেই পাশ্চাত্য মানসের ঐতিহাসিক দোষ-ত্রুটি ও দুর্বলতারই উত্তরাধিকারী হয়েছিল। পূর্ববর্তী চিন্তাবিদ ও নেতৃবৃন্দের ন্যায় তারাও কয়েকটি সত্য ও শাশ্বত নীতিকে গ্রহণ করে এবং তার সাথে মিশ্রিত করে কতকগুলো অত্যন্ত বাড়াবাড়িমূলক চিন্তা ও নীতি। কয়েকটি সত্য নীতি বাতিল করে দিয়ে তদস্থলে সংযোজিত করে কয়েকটি ভ্রান্ত নির্বুদ্ধিতা। এভাবে গোজামিল দিয়ে তারা এক সাম্যহীন জীবনব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করে।

তাদের গোজামিল দ্বারা রচিত জীবনব্যবস্থায় ভাল ও মন্দ, ভুল ও বিশুদ্ধ নীতির সংমিশ্রণ হয়েছিল কোন্ হারে ও কি নিয়মে এবং তার লাভ ও ক্ষতির বিয়োগ ফল কি দাঁড়িয়েছে তা যাচাই করে দেখা যেতে পারে। যদিও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে পরাজয়বরণ করে এ উভয় 'জোড় ভাই' বাহ্য দৃষ্টিতে নতি স্বীকার করেছে ; কিন্তু এদের প্রচারিত উদ্ভাবনী পরিবর্তিত নাম ও বেশ ধারণ করে বিভিন্ন দেশে এখনো বর্তমান রয়েছে। আমাদের নিজেদের দেশও এসব বিপদের ঊর্ধে এবং তা থেকে মুক্ত নয়। এজন্য ফ্যাসীবাদ ও নাৎসীবাদের মধ্যে ভাল দিক এবং মন্দ অংশ চিহ্নিতকরণ অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। এ প্রয়োজন বর্তমানেও ঠিক ততখানি তীব্র যতখানি ছিল যুদ্ধের পূর্বে।

ভাল এবং কল্যাণকর কাজ

কমিউনিষ্টদের দাবী এই যে, সমাজ ও জাতির জমিদার, পুঁজিদার শ্রেণী এবং শ্রমজীবি শ্রেণীর মধ্যে পারস্পরিক ঘৃণা, শত্রুতা, যুদ্ধই হচ্ছে প্রকৃত ও স্বভাবসম্মত সম্পর্ক। কিন্তু ফ্যাসীবাদী ও নাৎসীবাদীরা এর প্রতিবাদ করে। তাদের এ প্রতিবাদ অত্যন্ত সত্য। তাদের মতে আসল জিনিস 'শ্রেণী' নয়, সমাজ ও জাতিই হচ্ছে প্রকৃত ও মূল। এর বিভিন্ন অংশ ও অংগসমষ্টি ও সমগ্রের জন্য বিভিন্ন প্রকারের কল্যাণমূলক কাজ সম্পন্ন করে। ফ্যাসিষ্ট ও নাৎসীদের এ ধারণার সত্যতা অনস্বীকার্য। বস্তুত সমাজ ও জাতি এবং শ্রমজীবিদের মধ্যে প্রকৃত সম্পর্ক শত্রুতা ও যুদ্ধ-দ্বন্দ্বের নয়, বরং আনুকূল্য, সহযোগিতা ও পারস্পরিক কর্মের সম্পর্কই তাদের মধ্যে বিদ্যমান। তাদের দায়িত্ব হচ্ছে সকলের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি উৎপাদন করা এবং সামগ্রিক ও জাতীয় পর্যায়ে উৎপাদন বৃদ্ধি করে জাতীয় শক্তি ও সম্পদ বৃদ্ধি করা। এ আনুকূল্য ও পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতার কোনো অভাব অসম্পূর্ণতা কিংবা ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হলে তা দূর করা বাঞ্ছনীয়। দ্বন্দ্ব ও মতবিরোধ দেখা দিলে তা দূরীভূত করা আবশ্যক। তাকে বৃদ্ধি পাবার সুযোগ দেয়া এবং একই সমাজের বিভিন্ন অংশের পরস্পরের ধ্বংস ও উৎপাদনে উদ্যত হওয়া কিছুমাত্র বাঞ্ছনীয় নয়।

কমিউনিষ্টদের দাবী এই যে, সামগ্রিক স্বার্থের খাতিরে ব্যক্তিগত মালিকানা ও ব্যক্তিগত মুনাফা সন্ধান মূলতই ক্ষতিকারক, তা বিলীন হয়ে যাওয়াই বাঞ্ছনীয়। ফ্যাসিষ্ট ও নাৎসীবাদীগণ এ মতকেও বাতিল প্রমাণ করেছে। তাদের এ ধারণা খুবই সত্য যে, এ দুটি জিনিস স্বয়ং সামগ্রিক স্বার্থের পক্ষেই কল্যাণকর ও একান্ত জরুরী। তবে সেই জন্য শর্ত এই যে, 'অবাধ অর্থ ব্যবস্থার' ন্যায় তা যেন সীমাহীন না হয়, বরং তার কিছুটা সীমা নির্ধারণ করে দেয়া কর্তব্য। তারা বলেছে স্বীয় মুনাফা স্বার্থ লাভের জন্য চেষ্টা ও সাধনা করার অধিকার প্রত্যেক ব্যক্তিরই রয়েছে ; কিন্তু এ অধিকার সামগ্রিক স্বার্থের অধীন এবং তার আনুকূল্যে ব্যবহৃত হওয়া আবশ্যক—এর বিপরীত নয়। কেন্দ্রীয় অর্থব্যবস্থা (High Finance) খনিজ দ্রব্য, জাহাজ নির্মাণ ও পরিচালনা, যুদ্ধ সরঞ্জাম, শিল্প এবং এ ধরনের অন্যান্য বড় বড় কারবার (Big Business) ব্যক্তিগত মালিকানার অধীন থাকা উচিত নয়। যেসব ইজারা ও একচেটিয়া ব্যবসায়ে সামগ্রিক স্বার্থকে ব্যক্তি স্বার্থের উপর কুরবানী করা হয়, তা অনতিবিলম্বে খতম হওয়া দরকার। ব্যবসায়ের ক্ষেত্র থেকে ফটকা

বাজারী নিশ্চিতরূপে উৎখাত করতে হবে। ঋণদান ও ঋণ আদায়ের ব্যবস্থার সুদকে সম্পূর্ণ খতম করতে হবে।[১]

ব্যবসায় বাণিজ্যকে এমন কতগুলো নিয়ম-কানুনে সুসংবদ্ধ করতে হবে, যা তার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল লোকের স্বার্থের সাথে সামঞ্জস্যশীল হবে। কেবল একটি শ্রেণীর লোকদেরই স্বার্থের অনুকূল হবে না। এরপর একজন কারখানা মালিক পণ্য দ্রব্যের মূল্য ঠিকভাবে নির্ধারণ করে, উত্তম পণ্য উৎপাদন করে, মজুর-শ্রমিককে সচ্ছল ও সন্তুষ্ট রাখতে পারে, নিজের শিল্পের উন্নতি বিধানের জন্য চেষ্টিত থাকে এবং নিজের এসব কাজের বিনিময়ে সংগত সীমার মধ্যে থেকে মুনাফা গ্রহণ করে, তবে সে এমন কি অপরাধ করে যে, শুধু শুধুই তাকে জাতি ও সমাজের শত্রু মনে করতে হবে?

সরকার কেবল পুলিশ ও আদালতের দায়িত্ব পালন করবে, অর্থনৈতিক ব্যাপারে ও জীবনে ব্যাপক কাজ-কারবারের প্রতি কোনোই দৃষ্টি ও লক্ষ দিবে না, তাদের এ উদার ও নিরপেক্ষ মতকেও অতি সংগতভাবেই প্রত্যাহার করেছে। তারা বলেছে, জাতীয় পর্যায়ের অর্থনীতিতে বিভিন্ন অংশের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান, আনুকূল্য ও সহযোগিতা স্থাপন করা এবং দ্বন্দ্ব ও সংগ্রামের কারণসমূহ দূর করা জাতীয় রাষ্ট্রের ঐকান্তিক কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। তারা একদিকে ধর্মঘট এবং অপরদিকে উৎপাদনের উপায়-পন্থা ও শক্তি ব্যবহার করার চেষ্টা করেছে।[২] কারখানা 'লক আউট' ঘোষণা করা আইনত নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। মালিক ও কর্মচারীদের মিলন পরিষদ গঠন করেছে। তাদের মধ্যে অধিকার ও দায়িত্বকে ইনসাফ সহকারে নির্দিষ্ট করার চেষ্টা করেছে এবং ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসা করার জন্য পারস্পরিক কথাবার্তা চালানো, পঞ্চায়েত নিযুক্ত করা এবং শেষ পর্যায়ে বিচার বিভাগীয় ফায়সালা দানের এক সুনিয়মিত ব্যবস্থা কায়েম করেছে।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় বেকার, পংগু ও অক্ষম লোকদের কোনো দায়িত্বই গ্রহণ করা হয় না। কিন্তু ফ্যাসিষ্ট ও নাৎসীবাদে পুঁজিবাদের এ ত্রুটি দূর করার চেষ্টা করা হয়েছে। উপায়-উপার্জনহীন লোকদেরকে নিরাশ্রয় থাকতে দেয়া যে মারাত্মক ক্ষতি সাধিত হতে পারে, নাৎসী ও ফ্যাসিষ্টগণ তা অনুভব করতে পেরেছে এবং ব্যাপক ভিত্তিতে 'সোশ্যাল ইন্সিওরেন্স'—সামাজিক নিরাপত্তার

১. যদিও এরা সুদকে কার্যত বন্ধ করতে পারেননি, স্বয়ং রাষ্ট্রই ঋণ নিয়ে সুদ দিয়েছে। কিন্তু নাৎসী ও ফ্যাসিষ্ট উভয়ই সুদকে অন্যায় মনে করতো ও তা বন্ধ করার পক্ষপাতি ছিল।

২. ১৯৩৩ সনে নাৎসী পার্টি যখন ক্ষমতাসীন হয় তখন জার্মানীতে প্রায় ৮০ লক্ষ লোক বেকার ও রোযগারহীন ছিল, কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যে অবস্থার পরিবর্তন হয় ও কর্মী লোকের অভাব পরিলক্ষিত হয়।

ব্যবস্থা করেছে। এতে রোগ, বার্ধক্য, বেকারত্ব ও দুর্ঘটনার সময় কর্মচারীদের দান করা সম্ভব হয়েছে। উপরন্তু তারা প্রসূতি, শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণ, শিশু কল্যাণ, পংগু ও অক্ষমদের দেখাশোনা, যুদ্ধকালীন অংগহীনদের সাহায্য, উত্তরাধিকারীহীন বৃদ্ধদের দেখাশোনা এবং এ ধরনের অন্যান্য কল্যাণমূলক কাজের জন্য বিরাট প্রতিষ্ঠান কায়েম করেছে। যুদ্ধের পূর্বে জার্মানীতে এ ধরনের যেসব প্রতিষ্ঠান কাজ করতো, তা প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ লোকের নিরাপত্তা ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করেছিল।

পুঁজিবাদে সমস্ত অর্থনৈতিক কাজ-কারবার কোনো পরিকল্পনা, চিন্তা-ভাবনা ও সামঞ্জস্য বিধান ছাড়াই চলে থাকে। ফলে অর্থনৈতিক উপায়-উপাদান পূর্ণ মাত্রায় ব্যবহৃত হতে পারে না। যা ও যতটুকু ব্যবহৃত হয়, তাতে ভারসাম্য রক্ষিত হয় না। ফ্যাসিষ্ট ও নাৎসীবাদীগণ অবাধ অর্থনীতির এ দোষ দূর করার দিকে পূর্ণ লক্ষ আরোপ করেছে। এ উদ্দেশ্যে তারা জাতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, সংগঠন সামঞ্জস্য বিধানের (Co-ordination) কাজ রাষ্ট্র (সরকার) কর্তৃক করে নিয়েছে। অর্থনৈতিক জীবনের সমগ্র বিভাগের জন্যই বিশেষ পরিষদ গঠন করেছে এবং একটি সুসংগঠিত, সুসংবদ্ধ নিয়মে ও পদ্ধতিতে এভাবে উৎপাদন পরিমাণ আশ্চর্যজনকভাবে বৃদ্ধি করে দেয় এবং বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ অগ্রগতি সূচিত হয়।

নির্বুদ্ধিতা ও ক্ষতি

ফ্যাসীবাদ ও নাৎসীবাদের কল্যাণকর দিক সম্পর্কে উপরে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। কিন্তু এ কল্যাণ লাভ করার জন্য ইটালী ও জার্মানী কত বড় এবং কি মূল্য আদায় করেছে, তাও যাচাই করে দেখা আবশ্যক।

নাৎসী ও ফ্যাসিষ্ট দল শ্রেণীবিদ্বেষের মারাত্মক প্রভাব-প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে জাতিপূজার ঝাঝালো মদ, বংশ গৌরব ও অহংকারের মাতলামী, অপর জাতিসমূহের বিরুদ্ধে ঘৃণা, হিংসা, ক্রোধ ও আক্রোশের উত্তেজনা এবং বিশ্বজয় ও রাষ্ট্র দখল করার আবেগ উচ্ছ্বাস দানের ব্যবস্থা করেছিল। কিন্তু এ ধরনের কাজের ফল কখনোও কোনো জাতির পক্ষে কল্যাণকর হয়নি। জাতির সঠিক উত্থান ও লালন হতে পারে একমাত্র গঠনমূলক নৈতিকতা ও বিশুদ্ধ, পবিত্র জীবন-লক্ষের ভিত্তিতে। যে নেতা এ পন্থার পরিবর্তে ঘৃণা, বিপদের ঝুঁকি ও উত্তেজনা সৃষ্টিকেই জাতি গঠন, উন্নয়ন শক্তিশালী করণের উপায় হিসেবে গ্রহণ করে সে নিজ জাতির মেজাজ ও প্রকৃতিকেই নষ্ট করে ফেলে। আর এ উপায়ে উত্থিত ও গঠিত জাতি একদিন না একদিন সর্বাত্মক আঘাত খেতে বাধ্য হবে, তাতে একবিন্দু সন্দেহ থাকতে পারে না।

তারা নিজ নিজ জাতির কল্যাণ বিধানের উদ্দেশ্যে অর্থনৈতিক ও তামাদ্দুনিক সংশোধন সংস্কারের যে কর্মসূচী রচনা করেছে তাকে সহজ, সোজা ও যুক্তিসংগতভাবে কার্যকরী করার পরিবর্তে সম্পূর্ণ অর্থহীন ও অন্তঃসারশূন্য এক সমাজ ও রাষ্ট্র দর্শন রচনা করেছে। তাতে অসংখ্য বাড়াবাড়ি, চাতুর্য ও বাস্তব নির্বুদ্ধিতা এবং আহাম্মকী পুঞ্জীভূত হয়ে রয়েছে। এজন্য তারা প্রথম সূত্র রচনা করেছে ঃ সমাজ সূত্রের ব্যক্তির প্রতিষ্ঠা, অন্যথায় ব্যক্তির কোনো মূল্য নেই। অতপর সামনে অগ্রসর হয়ে বলেছে ঃ সমাজ সূত্রে যে ব্যক্তি গ্রথিত নয়, কিংবা এ সূত্রেই স্থায়িত্ব বিধান ও কার্যকারিতায় যে প্রতিবন্ধক, তার কিছু না থাকা ও না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এরপর যুক্তির প্রাসাদ রচনা করে বলেছে ঃ সমাজ সূত্রের প্রকৃত কার্যকারিতা ও প্রকাশ জাতীয় রাষ্ট্রের মাধ্যমেই সম্ভব এবং জাতীয় রাষ্ট্র সংগঠন পরিচালন ও দৃঢ়তা বিধান একান্তভাবে নির্ভরশীল হচ্ছে সেই পার্টির উপর, যে এ জাতীয় ঐক্য ও উন্নতিমূলক কার্যসূচীকে নিজস্ব প্রোগ্রাম হিসেবে নিয়ে দাঁড়িয়েছে। কাজেই "জার্মানী হও তো নাজী দলে আস" এবং "ইটালীয়ান হও তো ফ্যাসিষ্ট হও" এভাবে জাতি ও রাষ্ট্র এবং সরকার ও শাসক পার্টিকে সর্বোতভাবে এক ও অভিন্ন জিনিস বানিয়ে দেয়া হয়েছে। যে ব্যক্তিই ক্ষমতাসীন দলের সাথে কোনো ব্যাপারে মতবিরোধ করার সাহস করেছে, তাকেই জাতি ও জাতীয় রাষ্ট্রের দুশমন বলে ঘোষণা করা হয়েছে। সমালোচনা, তর্ক-বিতর্ক ও স্বাধীনভাবে মত প্রকাশকে এক ভয়ংকর জিনিস করে দেয়া হয়েছে। একটি দল ভিন্ন সমগ্র দেশে অপর কোনো দলকে জীবিত থাকতে দেয়া হয়নি। নির্বাচনকে একটি প্রহসন—এক অর্থহীন খেলায় পরিণত করা হয়েছে। জাতীয় মন-মগজকে সম্পূর্ণরূপে ও সামগ্রিকভাবে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে পুলিশ বাহিনী, রেডিও, শিক্ষালয়, শিল্পকলা, সাহিত্য ও থিয়েটার প্রভৃতিকে সর্বাত্মকভাবে সরকার করায়ত্ত করে নিয়েছে, যেন জাতির কর্ণকুহরে একটি মাত্র আওয়াজ ছাড়া দ্বিতীয় কোনো আওয়াজ আদৌ পৌছতে না পারে। শুধু এটাই নয়, ক্ষমতাসীন দলের মতামত ভিন্ন অন্য কোনো মতামত লোকদের মগজে জাগ্রতই হতে না পারে এবং কোনো বেয়াড়া মগজের জাতির 'খোদাকুলের' চিন্তা ও মতের বিপরীত কোনো চিন্তা জাগ্রত হলে তা হয় তার মগজেই লুপ্ত হয়ে থাকবে, নচেত তার মগজসহ গোটা মস্তককেই মাটিতে দাফন করে দেয়া হবে—এর পূর্ণাংগ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে। তারা বাহ্যত এক বড়ই বুদ্ধিসম্মত মতাদর্শ রচনা করে নিয়েছে। মতাদর্শটি এই যে,

সামাজিক ও জাতীয় জীবনে কোনো কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা রচিত না হলে বিশৃংখলা, বিশিষ্টতা ও পারস্পরিক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় এবং মোটামুটিভাবে শক্তি, সামর্থ ও উপায়-উপাদানের ব্যাপকভাবে অপচয় হয়। কাজেই গোটা জাতীয় জীবনকেই সুসংবদ্ধ হতে হবে এবং এককেন্দ্রীক সরকারের অধীন এক কেন্দ্রীয় শক্তির নির্ধারিত পরিকল্পনা ও কার্যসূচী অনুযায়ী সমগ্র দেশবাসীকেই একটি যন্ত্রের বিভিন্ন অংশের ন্যায় যথানিয়মে কাজ করে যেতে হবে। তাদের মতে উৎপাদন, উন্নয়ন ও সচ্ছলতা বিধানের কর্মতৎপরতাকে খুব দ্রুততর গতিতে সামনে অগ্রসর করে নেয়ার এটাই হচ্ছে উপায়। এ মতাদর্শ অনুযায়ী তারা সমগ্র দেশের লোকদের জীবনকে—জীবনের অর্থনৈতিক, তামাদ্দুনিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সকল দিক ও বিভাগকেই একটি নিয়মতন্ত্রের দুশ্ছেদ্য বাঁধনে বেঁধে দিয়েছে। সকলকে ওসব কিছুকেই একটি ধরাবাধা নিয়মে পরিচালিত করতে শুরু করেছে। তাদের জীবন পদ্ধতিতে সবকিছুই নির্দিষ্ট ও সংঘবদ্ধ ছিল। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের কাজ নির্দিষ্ট, মজুরী নির্দিষ্ট ; মূল্য, অধিকার ও কর্তব্য নির্দিষ্ট ; শক্তি যোগ্যতার ব্যবহার পদ্ধতি নির্দিষ্ট, পুঁজি উপায়-উপাদানের ব্যবহার ক্ষেত্র নির্দিষ্ট। এমনকি চিন্তা ও কল্পনা, গবেষণা এবং আভ্যন্তরীণ ভাবধারা ও প্রবণতার প্রকাশপথ পর্যন্ত সেখানে নির্দিষ্ট। আর এ সবকিছুর জন্য সেখানে কয়েক বছরকালের বিস্তারিত কার্যসূচী পর্যন্ত নির্দিষ্ট। এখন যারা কেবলমাত্র জাতির খাতিরে এত কষ্ট ভোগ করে এবং এত মস্তিষ্ক খাটিয়ে সমগ্র জাতীয় জীবনের জন্য এতবড় একটি পরিকল্পনা রচনা করেছে, তারা কোনো ব্যক্তির সমালোচনা করা ও সমালোচনার দ্বারা সাধারণ লোকদের মন-মগজ খারাপ করাকে কিরূপে বরদাশত করতে পারে ? যেসব কর্মচারীর নির্দিষ্ট কাজে আত্মনিয়োগ করা উচিত, তাদেরকে উল্টো তর্কে জড়িত করা এবং এ অপরিসীম শ্রম মেহনত দ্বারা রচিত পরিকল্পনা সম্পর্কে জনগণের আস্থা ও নির্ভরতার ভাবকে খতম করে দেয়া কি করে সহ্য করা যেতে পারে ? অতএব এ 'পরিকল্পনাবদ্ধ' জীবনের অন্তর্নিহিত প্রবণতার দাবীতেই সমালোচনা ও মত প্রকাশ করার অবাধ সুযোগ সহ্য করার জন্য তারা বিন্দুমাত্র প্রস্তুত ছিল না। বরং তাদের প্রবল দাবী এই ছিল যে, কারো মত প্রকাশ করতে হলে কর্তাদের নির্ধারিত কার্যসূচীর অনুকূলে ও সমর্থনে করতে হবে। অন্যথায় প্রত্যেককেই নিজের মুখ বন্ধ রাখতে হবে ; অর্থাৎ পরিকল্পনা করা হলে মুখ বন্ধ করতে হবে, সেই সাথে চিন্তা-কল্পনার কাজকে অবশ্যই বন্ধ রাখতে হবে। মতবিরোধ

করার পথ বন্ধ, তর্ক-বিতর্ক বন্ধ, সমালোচনা বন্ধ, জিজ্ঞাসাবাদ ও যাচাই-হিসাব করা বন্ধ, এক কথায় কয়েকজন লোকের মস্তিষ্ক ছাড়া সমগ্র জাতির চিন্তা-ভাবনাও চূড়ান্তভাবে বন্ধ ও নিষ্ক্রিয় থাকতে হবে।

এখানে আবার সেই প্রথমকার প্রশ্নই জাগ্রত হয়। নাৎসী ও ফ্যাসিষ্ট মতবাদ যা কিছু দেয়, এ অসামান্য মূল্যের বিনিময়ে তা কি গ্রহণ করার যোগ্য ? সমগ্র জাতির মধ্যে শুধু কয়েকজন লোক মানুষ, আর অবশিষ্ট সকলেই হবে জানোয়ারের শামিল বরং হবে এক নিষ্প্রাণ যন্ত্রের অংশমাত্র। এ মূল্য আদায় করলে সেখানে প্রয়োজনীয় খাদ্য লাভের নিরাপত্তা লাভ হতে পারে, অন্যথায় নয়।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থার আভ্যন্তরীণ সংস্কার ও সংশোধন

যেসব দেশে উদার নৈতিক গণতন্ত্রের শিকড় সুদৃঢ়ভাবে প্রোথিত ছিল, সেসব দেশের লোক পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে তার মূলভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত রেখে, তাতে কোন্ ধরনের সংশোধন ও সংস্কার কার্যকরী করেছে এবং তার ফলাফলইবা কি হয়েছে, বর্তমান পর্য্যায়ে আমরা তারই আলোচনা করবো।

পূর্বেই ইংগিত করা হয়েছে, অষ্টাদশ শতকে বুর্জোয়া শ্রেণী এক দিকে নিজেদের অর্থনৈতিক স্বার্থ সুবিধার খাতিরে 'অবাধ অর্থনীতি' উপস্থাপিত করছিল, আর অপরদিকে এ বুর্জোয়া শ্রেণীই রাজনৈতিক স্বার্থ উদ্ধারের উদ্দেশ্যে গণতন্ত্র, সাম্য ও সম অধিকার এবং জনগণের সার্বভৌমত্বের শ্লোগানে আকাশ-বাতাস মথিত করছিল। মত প্রকাশ করার স্বাধীনতা, চিন্তা ও গবেষণার স্বাধীনতা, লেখা ও বলার বা বক্তৃতার স্বাধীনতা এবং সভাসম্মেলন ও সংগঠনের স্বাধীনতার অধিকার দাবী করছিল। এমনকি, তারা অত্যন্ত জোরালো ভাষায় একথাও বলে বেড়াচ্ছিল যে, দুঃসহনীয় নির্যাতন-নিষ্পেষণ ও বলপ্রয়োগের জবাবে জনগণ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে পারে। প্রথমত তারা যখন এসব মতামত প্রকাশ করছিল, তখন তারা কেবল রাজ বংশ, ভূস্বামী ও গীর্জার পাদ্রী-পুরোহিতদের সামনে রেখেই এসব কথা বলতো। এদেরকেই চোখের সামনে তারা দেখতে পেতো, আর তাদের বিরুদ্ধে দেখতে পেতো কেবল নিজেদেরকে। এ কারণে—তারা যে অবাধ ব্যক্তিতন্ত্রের উপর অর্থব্যবস্থা এবং যে গণতন্ত্র ও তামাদ্দুনিক সাম্যের রাষ্টব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে চাচ্ছিল, তা যে কোনো সময়ে পরস্পরের বিপরীত হবে ও উভয়ে কঠিন সংঘর্ষে লিপ্ত হবে তা অনুভব ও ধারণা পর্যন্ত করতে পারেনি।

তাদের চেষ্টা-সাধনার ফলে বিভিন্ন দেশে যখন নবতর গণতন্ত্র বাস্তবায়িত হতে শুরু করলো এবং ভূমি-মালিকদের থেকে শুরু করে ব্যবসায়ী, কারখানাদার ও মহাজনী কারবারকারী লোকদের পর্যন্ত ভোটাধিকার বিস্তার লাভ করলো, তখন তা থেকে শ্রমিক-মজুর, কৃষক-জনতাকে বঞ্চিত করা কোনো যুক্তিতেই আর সম্ভব রইলো না। কিন্তু তবুও বুর্জোয়া গোষ্ঠী তাদেরকে বঞ্চিত করতেই চেষ্টা করতে লাগলো। ফলে তাদের নিজেদেরই অপকৌশল তাদেরই বিরুদ্ধে কাজ করতে শুরু করলো। শেষ পর্যন্ত ক্রমশ আপামর জনগণের ভোটাধিকার স্বীকার করে নিতে তারা বাধ্য হলো, যেমন করে কিছুকাল পূর্বে ভূমি মালিকগণ স্বয়ং তাদেরই ভোটাধিকার মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল। অতপর এমন কোনো যুক্তিই আর খুঁজে পাওয়া গেল না, যার ভিত্তিতে একথাকে যুক্তিসঙ্গত মনে করা যেতে পারে যে, মালিকগণতো নিজেদের সংগঠন করতে পারবে, কিন্তু শ্রমিকদের পক্ষে কোনো সংগঠন করা সংগত নয়। কিংবা মালিকগণ তো নিজেদের শর্ত ও রীতিনীতি সম্মিলিত শক্তির সাহায্যে মজুরদের উপর আরোপ করবে, কিন্তু শ্রমজীবিগণ নিজেদের দলীয় শক্তির সাহায্যে নিজেদের শর্ত ও দাবী-দাওয়া স্বীকার করার অধিকার পাবে না—এটা সবই অসংগত ও অমূলক প্রমাণিত হলো। এভাবে ধীরে ধীরে স্বীকার করে নেয়া হয় যে, মজুর ও কর্মচারীদের নিজস্ব সমিতি গঠন করা, একাকী নয়—দলীয় শক্তির সাহায্যে মজুরী-বেতন ও অন্যান্য শর্ত সম্পর্কে কথাবার্তা চালাবার, নিজেদের অভাব-অভিযোগসমূহ পরিপূরণ করার জন্য ধর্মঘটের হাতিয়ার প্রয়োগ করার এবং ধর্মঘটকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য প্রতিরোধ গড়ে তোলার পূর্ণ অধিকার রয়েছে।

রাষ্ট্রের কাজ শুধু ব্যক্তি স্বাধীনতা সংরক্ষণ, জাতীয় রাষ্ট্রের ইতিবাচক কর্তব্য ও দায়িত্ব কিছুই নেই—এ ধরনের প্রাচীন রাজনৈতিক মতামত ঊনবিংশ শতক শেষ হওয়ার সাথে সাথে অপসৃত হয়ে যায়। তদস্থলে গণ-অধিকার ও গণতন্ত্র সম্পর্কে নতুন মত দানা বেঁধে উঠতে থাকে। একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র দেশবাসীর সম্মিলিত অভিমতেরই বহিঃপ্রকাশ, জনগণ নিজেদেরই রাজনৈতিক ক্ষমতাকে রাষ্ট্রের রূপে রূপায়িত করে—রাষ্ট্রভুক্তিতে কেন্দ্রীভূত ও সুসংবদ্ধ করে নেয়। তাহলে গণতান্ত্রিক সরকারের কর্মক্ষেত্রকে (Jurisdiction) পূর্বতন রাজতান্ত্রিক সরকারসমূহের মত এখনো সীমাবদ্ধ করে রাখার জন্যই প্রচেষ্টা চালাতে হবে কেন ? গণতান্ত্রিক সরকারের কর্তব্য কেবল নেতিবাচকই হওয়া উচিত নয়, ইতিবাচকভাবে সামগ্রিক স্বার্থের জন্য কাজ করাই তার দায়িত্ব হওয়া বাঞ্ছনীয়। সমাজে কোনো প্রকার যুলুম-অবিচার-অনাচার অনুষ্ঠিত হতে থাকলে আইন প্রণয়ন ও প্রশাসনিক

(Administrative) হস্তক্ষেপ—উভয়ের সাহায্যেই তার প্রতিবিধান গণতান্ত্রিক সরকারের কর্তব্যভুক্ত হওয়া উচিত।

ঠিক এরূপ অবস্থায়ই প্রথম মহাযুদ্ধের দামামা বেজে উঠে। তার পর রাশিয়ায় কমিউনিষ্ট বিপ্লব অনুষ্ঠিত হয়। এ বিপ্লব বুর্জোয়া শ্রেণীর স্ত্রীলোক ও শিশুদেরকে কুলুর বলদের ন্যায় উৎপাদন যন্ত্রের সাথে জুড়ে দেয়। অতপর জার্মানী ও ইটালীতে যথাক্রমে ফ্যাসীবাদ ও নাৎসীবাদের রূপে তার প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। এতে বুর্জোয়া ও শ্রমজীবি জনতা সকলেই এক শক্ত অত্যাচারমূলক শাসনব্যবস্থার অক্টোপাশে বন্দী হয়ে পড়ে। এসব ঘটনা পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে অনেকটা 'উদারপন্থী' করে দেয় এবং কিছুটা জনগণের ক্রমবর্ধনশীল শক্তির চাপে এবং কিছুটা নিজেদের ইচ্ছার প্রাচীন অবাধ অর্থব্যবস্থায় নিম্নলিখিত পরিবর্তন সূচিত করে ঃ

এক ঃ অর্থনৈতিক জীবনের প্রত্যেক বিভাগে মজুর ও কর্মচারীদের প্রতিনিধিত্বমূলক সংগঠনের অধিকার যথাযথভাবে মেনে নেয়া হয়। সেই সাথে কতকটা প্রচলন ও আইন সম্মতভাবে এমন কতকগুলো বাস্তব ব্যবস্থাপনা গ্রহণের সুযোগকেও স্বীকৃতি দান করা হয় যা মজুর ও কর্মচারীদের ইউনিয়ন নিজেদের দাবী-দাওয়া আদায় করা এবং সেই জন্য যথাসম্ভব চাপ দেয়ার জন্য ব্যবহার করতে পারে। এভাবে পুঁজি ও শ্রমের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও টানা-হেঁচড়া যদিও চূড়ান্তভাবে শেষ হয়ে যায়নি ; কিন্তু এ সময় শ্রম-মেহনত অবাধ অর্থনীতি পর্যায়ের পুঁজির সামনে অসহায় হয়েও থাকেনি।

দুই ঃ মজুরী বৃদ্ধি, কাজের হ্রাস, কাজের অবস্থার আনুকূল্য নারী ও শিশুদেরকে শ্রমিক নিযুক্ত করার উপর বাধা-নিষেধ আরোপ, মজুরের জীবন ও স্বাস্থ্যের প্রতি অপেক্ষাকৃত অধিক লক্ষ দান, তার ঘর ও পরিবেশ পূর্বাপেক্ষা উন্নত বানাবার চেষ্টা, শারীরিক কোনো ক্ষতি—অংগহানী ইত্যাদি ঘটলে তার ক্ষতিপূরণ এবং সামাজিক নিরাপত্তার কোনো কোনো স্কীম কার্যকরীকরণ —এ সবকিছুই যদিও বাঞ্ছিত মানে হয়নি ; কিন্তু শ্রমিক ও নিম্নস্তরের কর্মচারীদের অবস্থা পূর্বের মত অতখানি হীনও থেকে যায়নি।

তিন ঃ শ্রম ও পুঁজির পারস্পরিক দ্বন্দ্বে সরকারকে বিচারক ও 'মীমাংসাকারী' রূপে মেনে নেয়া হলো। এদের এ দ্বন্দ্ব দূর করা ও ঝগড়া-বিবাদ মিটাবার জন্য বিভিন্ন আইননিষ্ঠ পন্থা ও উপায় নির্ধারণ করা হয়। এ জিনিস যদিও খুব ব্যাপকভাবে সম্পন্ন হয়নি, যদিও প্রত্যেক অর্থনৈতিক বিভাগে শ্রমিক মালিকের মধ্যে ইনসাফ পূর্ণভাবে অধিকার ও কর্তব্য নির্ধারণ করা এর ভিত্তিতে

সম্ভব নয় এবং অর্থনৈতিক বিবাদ-বিসম্বাদের ক্ষেত্রে বিচার বিভাগীয় মীমাংসা দানের কাজ যদিও এখন পর্যন্ত সরকার নিজ হাতে গ্রহণ করেনি, কিন্তু তবুও নীতিগতভাবে সরকারের এ অধিকার ও কর্তব্য স্বীকার করে নেয়া হয়।

চার ঃ মূলনীতি হিসেবে এটাও স্বীকার করা হয় যে, ব্যক্তিগত মুনাফা লুণ্ঠনের উপর এমন বাধা-নিষেধ আরোপ হওয়া আবশ্যক, যাতে তা সামাজিক ও সামগ্রিক স্বার্থের পরিপন্থী হয়ে না পড়তে পারে। আর এ ধরনের বাধা-নিষেধ আরোপ করা সরকারেরই কর্তব্য।

পাঁচ ঃ অনেক সরকারই এমন সব অর্থনৈতিক কাজ সম্পন্ন করার দায়িত্ব গ্রহণ করে, যা ব্যক্তিগত পর্যায়ে করা সম্ভবই নয় ; কিংবা যা ব্যক্তির হাতে সোপর্দ করলে সামগ্রিক স্বার্থ নষ্ট হবার সম্ভাবনা। যেমন ডাক ও তার বিভাগ, যানবাহন ব্যবস্থা, রাস্তাঘাট নির্মাণ ও তা সঠিক অবস্থায় রাখা, বন-জংগল রক্ষণাবেক্ষণ ও বিলি ব্যবস্থা, পানি পরিবেশন ও সেচ, জল-বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বণ্টন, বিতরণ ও অর্থনিয়ন্ত্রণ। এছাড়া খনিজ সম্পদকেও সরকার স্বীয় ইজারাদারিতে গ্রহণ করে নেয়। বড় বড় শিল্পও স্বীয় ব্যবস্থাধীন চালাতে শুরু করে।

ছয় ঃ স্বল্প আয়ের শ্রমিক ও কর্মচারীদের জন্য এমন ব্যবস্থা করে দেয়া হয়েছে, যাতে তারা অল্প অল্প করে সঞ্চয় করতে, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ও শিল্প-কারখানা কোম্পানীর কম মূল্যের অংশ খরীদ করতে পারে। অনেক স্থানে আবার বিশেষ নিয়ম অনুযায়ী কর্মচারী ও শ্রমিক-মজুরগণ তাদের পারিশ্রমিকের একটা অংশ নগদ পেয়ে যায়, আর একটি অংশ তাদের পক্ষ থেকে কোম্পানীর মূলধনের সাথে শামিল হয়ে যায়। এভাবে অসংখ্য শ্রমজীবি কর্মচারী তাদের কোম্পানী বা কর্পোরেশনের মালিকানার অংশীদারও হয়ে বসেছে। অনেক প্রখ্যাত কারখানার শতকরা ৮০ ভাগ—৯০ ভাগ মজুর ও কর্মচারী মালিকানায় শরীক হয়ে গেছে এবং কিস্তিবন্দীতে অংশ খরীদ করার সহজ ব্যবস্থা থাকার দরুন শিল্প-কারখানায় তাদের অংশীদারিত্বের হার ক্রমশ বর্ধিত হচ্ছে।

পুঁজিবাদী সমাজের অবশিষ্ট দোষ-ত্রুটি

কিন্তু এ সমস্ত পরিবর্তন, সংশোধন ও সংস্কার সাধনের পরও এখন পর্যন্ত পুঁজিবাদী সমাজের মৌলিক দোষ-ত্রুটি পূর্বানুরূপই বর্তমান রয়েছে, তা কিছুমাত্র বিলুপ্ত হয়নি।

এখন পর্যন্ত পুঁজিবাদী সমাজ হতে বেকার সমস্যার মূলোৎপাটন সম্ভব হয়নি। বরং এক যুদ্ধকালীন সময় ছাড়া সকল সময় ও অবস্থায় এটা পুঁজিবাদী

সমাজের এক স্থায়ী রোগ হয়ে বসেছে। আমেরিকার মত দেশে যারা শিল্প-বাণিজ্য ও ধন উৎপাদনে আকাশ স্পর্শ করেছে—যুদ্ধজনিত তৎপরতা হ্রাসপ্রাপ্ত হলেই ৩২ লক্ষেরও বেশী লোক বেকার হয়ে যায়। ১১৪৯ সনের এপ্রিল ও মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে এদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৩৫ লক্ষেরও অধিক হয় এবং জুন মাসে ৪০ লক্ষ পর্যন্ত পৌঁছে। বস্তুত ব্যবসায়, শিল্প ও বাণিজ্যের বাজার গরম হোক কি মন্দা—উভয় অবস্থায়ই বেকারত্ব পুঁজিবাদী সমাজের এক অপরিহার্য অংশ হয়ে থাকে।

পূর্বে যে বিস্ময়কর রহস্যের দিকে আমরা ইংগিত করেছি, এখনো তা দুর্বোধ্য ও অনুদঘাটিতই থেকে গেছে। একদিকে তো কোটি কোটি মানুষ জীবন জীবিকার অভাবে কাতর, বিলাস দ্রব্যও পেতে আগ্রহশীল, সীমা-সংখ্যাহীন প্রাকৃতিক দ্রব্য-সামগ্রী স্তপীকৃত রয়েছে, যা ব্যবহার করে আরো অধিক দ্রব্য প্রস্তুত করা যেতে পারে ; লক্ষ লক্ষ মানুষও এমন রয়েছে, যাদেরকে কর্মে নিয়োগ করতে পারে। কিন্তু অপরদিকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা দুনিয়ার প্রয়োজন ও সম্ভাব্য ভোগ-ব্যবহার (Consumption) ও কাট্তি থেকে অনেক কম যে পণ্য উৎপন্ন করে, তাও বাজারে অবিক্রিত অবস্থায় পড়ে থাকে। কেননা তা ক্রয় করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ লোকদের হাতে নেই। আর এ স্বল্প পরিমাণ পণ্যই যখন বিক্রি হয় না, তখন আরো অধিক লোককে কর্মেনিয়োগ করা ও প্রাকৃতিক উপায়-উপাদান ব্যবহার করার সাহস করা যেতে পারে না। আর মানুষকে যখন কর্মেই নিয়োগ করা যায় না, তখন তাদের মধ্যে ক্রয়শক্তি উদ্ভাবনেরও কোনো উপায় হতে পারে না।

কেবল এটাই নয়, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় আরো একটি দোষ বর্তমান রয়েছে। প্রত্যেক বছরেই বিপুল পরিমাণে উৎপাদিত পণ্য, ফসল, ফল ও অন্যান্য দ্রব্যাদি বাজারে ছাড়ার পরিবর্তে ইচ্ছা করেই নষ্ট করে ফেলা হয়। অথচ কোটি কোটি মানুষ এ দ্রব্যাদির জন্য অভাবগ্রস্ত হয়ে রয়েছে। পুঁজিপতি এ দ্রব্যাদী ধ্বংস করে দিতে এবং এ ধ্বংসের কাজে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে দিতে প্রস্তুত ; কিন্তু তা বাজারে ছেড়ে তার মূল্য কমাতে, অপেক্ষাকৃত সস্তা মূল্যে প্রয়োজনশীল মানুষের জন্য তা সহজলভ্য করে দিতে কিছুমাত্র রাযী নয়।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থার আর একটি দোষ অত্যন্ত মারাত্মক। রাষ্ট্র, সমাজ, ধনী শ্রেণী—মোটকথা কেউই নিজেকে অভাবগ্রস্ত লক্ষ কোটি মানুষের ভরণ-পোষণ ও অভাব পূরণের জন্য দায়ী মনে করে না। যদিও এদের মধ্যে এমন অনেক লোক রয়েছে, যারা কর্মক্ষম হওয়া সত্ত্বেও বেকার কিংবা এখন পর্যন্ত

কর্মক্ষম হয়ে উঠেনি, অথবা সাময়িক কি স্থায়ীভাবে অক্ষম ও পংগু হয়ে গেছে। পুঁজিবাদী সমাজে এখনো সেই রোগীরাই চিকিৎসা পাবার অধিকারী, যাদের পকেটে পয়সা আছে, শিক্ষা কেবল সেই ইয়াতীম বালক পায়, যার পিতা জীবন বীমার 'পলিসি' রেখে মরেছে। দুর্ঘটনায় পড়ে এখনো কেবল সেই ব্যক্তিই মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে পূর্বে যার শুভকাল অতীত হয়েছে এবং যে নিজেই খারাপ সময়ের জন্য আশ্রয় পাবার ব্যবস্থা করে নিয়েছে। মোটকথা এখন পর্যন্ত বিপদগ্রস্ত অভাবী ও নিরুপায় ব্যক্তিদের দায়িত্ব কারো উপর ন্যস্ত হয়নি, অস্বাভাবিকভাবে কারো কোনো সাহায্য লাভ করতে পারা অবশ্য স্বতন্ত্র কথা।

পুঁজিবাদী সমাজে এখন পর্যন্ত কৃত্রিম উপায়ে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করে দেয়া হয় ; রীতিমত পরিকল্পনা রচনা করে কোনো কোনো জিনিসের অভাব সৃষ্টি করা হয়। আর এটা কিছুমাত্র কম দোষের ব্যাপার নয়। অজ্ঞাত বেচাকেনা ও ব্যবসায়ী জুয়ার বিভিন্ন নিয়ম-নীতি এখনো সামগ্রিক অর্থনীতির প্রকৃতিকে রাত-দিন চূর্ণ-বিচূর্ণ করতে থাকে। এখনো মানুষ কোনো না কোনোভাবে যথেষ্ট পরিমাণে পুঁজি সংগ্রহ করতে পারলে ব্যক্তিগত মুনাফার লোভে যে কোনো মাল যত পরিমাণ ইচ্ছা তৈরি করতে পারে এবং তাকে যে কোনো উপায়ে হোক সমাজের লোকদের উপর চাপিয়ে দিতে চেষ্টা করতে পারে। সমাজে তার প্রয়োজন থাকুক কি না-ই থাকুক, কিন্তু সে কাজে কোনো বাধা নেই ; এমনকি সে জিনিস যদি সমাজের পক্ষে ক্ষতিকরও হয়, তবুও তা উৎপন্ন ও বিক্রি করা যেতে পারে। এখনো সেখানে সমাজ ও জাতির কঠিন প্রয়োজনীয় কাজ বন্ধ করে রাখা হয় এবং শ্রম ও পুঁজি বিপুল পরিমাণে ব্যয় করা হয়, আনন্দ-স্ফূর্তির কাজে বিলাস দ্রব্য উৎপাদনে, পাশবিক লালসা পরিতৃপ্তির সামগ্রী সংগ্রহে এবং সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য, ভোগ ও সম্ভোগের পাহাড় সৃষ্টির কাজে। এটা কি কম আশ্চর্যের ব্যাপার ! এখনো শিল্প ও ব্যবসায়ের বাদশাহরা ও অর্থ বিভাগের সম্রাটরা নিজেদের স্বার্থোদ্ধারের উদ্দেশ্যে গোপনে ও প্রকাশ্যে এমন সব কলা-কৌশল ও কূটনীতি প্রয়োগ করে থাকে, যার ফলে আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ, হিংসা-দ্বেষ এবং যুদ্ধ-বিগ্রহের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে।

পুঁজিপতি ব্যবস্থায় এখনো সমাজ রাষ্ট্রের উপর কর্তৃত্ব করে ধনী পুঁজিপতি ও ব্যাংক মালিক-মহাজনগণ। আর সমগ্র জাতীয় মূল্যমানকে সুদের হার এর মানদণ্ডে যাচাই করে, তারই কেন্দ্রে তাকে চক্রাকারে আবর্তিত করে। পুঁজি কোন্ সব কাজে ব্যয় করা হবে, কোন কাজে ব্যয় করা উচিত হবে না, তার ফায়সালা করার মালিক এখনো সেই পুঁজিপতিরাই। আর এ ফায়সালার

ব্যাপারে তারা সমাজ ও জাতির প্রয়োজন ও কল্যাণের দিকে কিছুমাত্র লক্ষ রাখে না। বরং তারা শুধু দেখে বাজারের প্রচলিত সুদের সমান কিংবা ততোধিক মুনাফা কোন্ সব কাজে হাসিল করা যাবে। এরূপ যাচাই নীতির ফলে পানি পরিবেশন বা জলসেচের পরিবর্তে মদ রফতানীতে মুনাফা বেশী হওয়ার সম্ভাবনা হলে জনগণকে পানির অভাবে পিপাসার্ত রেখেও বিলাসী লোকদের জন্য মদ পরিবেশনের চিন্তায় ও উপায়-উদ্ভাবনে আত্মনিয়োগ করতে একবিন্দু কুণ্ঠিত বা লজ্জিত হবে না।

পুঁজিবাদী সমাজের দেহে এখনো ব্যবসায়ী আবর্তন (Trade Cycle)-এর রোগ লেগে আছে। ফলে প্রত্যেক কয়েক বছরকালীন চড়া বাজারের পর দুনিয়ার অর্থনীতিতে মন্দা বাজারের আবর্তন সৃষ্টি হয়। ব্যবসায়-বাণিজ্যের জগত খুব তীব্রতা ও সততা সহকারে অবাধে ও নির্লিপ্তে চলতে থাকে, সহসা এবং আকস্মিকভাবে ব্যবসায়ীগণ অনুভব করে যে, যেসব মাল তাদের গুদামে এসে জমা হচ্ছে, তা সঠিক গতিতে বাহির ও বিক্রি হচ্ছে না। তখন তারা নূতন মালের অর্ডার দেয়া কিছু সময়ের জন্য বন্ধ করে দেয়। শিল্পোৎপাদক এ অবস্থা দেখে উৎপাদন থেকে কিছুটা হাত গুটিয়ে নেয়। পুঁজিদার এ বিপদের সংকেত পাওয়া মাত্রই ঋণ দান বন্ধ করে এবং পূর্বের দেয়া ঋণও সে ফিরিয়ে নিতে চায়। তার দরুন কারখানা বন্ধ হতে শুরু করে, বেকার সমস্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে, দ্রব্যমূল্য ক্রমশ হ্রাসপ্রাপ্ত হতে থাকে। ব্যবসায়ী ও খরীদ্দার দ্রব্যমূল্য আরো কমে যাওয়ার আশায় অর্ডার দেয়া ও খরিদ করা সাময়িকভাবে বন্ধ রাখে। যেসব কারখানা তখনো চলতে থাকে, সেগুলো উৎপাদনের হার কমিয়ে দেয়। ফলে বেকারত্ব আরো তীব্র হয়ে দেখা দেয়। সরকারসমূহ আয় কম হতে দেখে ব্যয়ের খাত কমিয়ে দেয়, মন্দাবাজার আরো অধিক মন্দা হয়ে যায়। এভাবে প্রত্যেকটি পিছনের দিকে পদক্ষেপ আরো অধিক পশ্চাদপসরণের কারণ হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত ও সামগ্রিক দেউলিয়া অবস্থার প্রান্তসীমায় যখন নিকটবর্তী হয়ে পড়ে তখন সহসাই গতি পরিবর্তন হয়ে যায়। ধীরে ধীরে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেতে শুরু করে, ফলে আবার চড়াবাজারী আরম্ভ হয়ে যায়। এ আবর্তন পুঁজিবাদী সমাজের এক স্থায়ী রোগ হয়ে আছে। আর আজ পর্যন্ত এর কোনো চিকিৎসা—কোনো প্রতিবিধান সূচিত হয়নি।

এ ধরনের ছোট বড় অসংখ্য দোষ-ত্রুটি এখন পর্যন্ত নিয়ন্ত্রিত ও সংশোধিত পুঁজিবাদী ব্যবস্থায়—ঊনবিংশ শতাব্দীর অবাধ ও হিংস্র পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মতোই—বর্তমান রয়েছে। এতে সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হচ্ছে যে, গণতন্ত্র এ অর্থব্যবস্থার অন্তর্নিহিত দোষ-ত্রুটির মূল কারণসমূহ উপলব্ধি করে

সতর্কতা ও বিচক্ষণতা সহকারে তা দূর করতে কিছুমাত্র চেষ্টা করেনি— কোনো কার্যকরী পন্থা গ্রহণ করেনি। বরং হয়েছে শুধু এতটুকু যে শ্রমজীবি মেহনতী জনতার চাপ বৃদ্ধি পেয়েছে, কিংবা কমিউনিজমের ক্রমবর্ধমান বিভীষিকা যতই তীব্র হয়েছে, বুর্জোয়া শ্রেণী নিজেদের নিয়ম নীতি ও কর্ম-কৌশলে অনেক কিছু সংশোধন ও পরিবর্তন সূচিত করে নিয়েছে, এর ফলে জনগণের অভিযোগ এতখানি দূর হয়ে গেছে, যার কারণে কমিউনিষ্ট ধোঁকাবাজরা খুব বেশী সুবিধা করে উঠতে পারছে না।

❐

ইতিহাসের শিক্ষা

ইতিপূর্বে অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় যে ঐতিহাসিক আলোচনা পেশ করা হয়েছে, তার উপর এক সামগ্রিক দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে প্রত্যেকেরই সামনে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হবে।

এ আলোচনা থেকে প্রথমত পাশ্চাত্য দেশের অর্থনৈতিক ইতিহাস ও আমাদের বর্তমান সমষ্টিগত জীবনের সম্মিলিত সমস্যা ও জটিলতাসমূহ পরিষ্কারভাবে জানতে পারা যায়। দেখা যায়, এখানে জায়গীরদার ব্যবস্থাও বহু প্রকারের বিশেষত্ব নিয়ে স্বশরীরে ও বহাল তবিয়তে বর্তমান রয়েছে। সেই সাথে আধুনিক পুঁজিবাদী ও বহু প্রকারের দোষ-ক্রটি নিয়ে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। কতগুলো রোগ আমরা আমাদের পতন যুগের নিকট থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছি। আর কতগুলো পাশ্চাত্যের শিল্পবিপ্লব ও পুঁজিবাদী ব্যবস্থার দৌলতে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে। তবে পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, এখানে কোনো পোপতন্ত্র ও গীর্জাধিপত্য ব্যবস্থা বর্তমান নেই। এমন কোনো পুরোহিত শ্রেণীও (Priest Class) বর্তমান নেই, যার সাথে ধনীদের যোগ-সাজস গড়ে উঠতে পারে এবং আল্লাহ ও ধর্মের দোহাই দিয়ে অন্যায় প্রাধান্য বিশেষত্ব ও জবরদস্তীমূলক অধিকারের সাহায্য ও সমর্থন করতে পারে।

আমাদের দেশের তথাকথিত হোমড়া-চোমড়ারা দেশ ও সমাজের সমস্যা ও জটিলতার সমাধানের উদ্দেশ্যে নিত্য যেসব মজাদার প্রস্তাবাদী পেশ করে থাকে, তা যে কোথা থেকে আসে, তা প্রত্যেক পাঠকই উপরোক্ত ঐতিহাসিক আলোচনা থেকে জানতে পারেন। আমরা এই যে শুনতে পাই, কেউ সামাজিক পরিকল্পনাবাদের গুরুত্ব বর্ণনা করেন, কেউ দেশের অর্থব্যবস্থায় 'বিপ্লবাত্মক' পরিবর্তন করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন, কেউ বলেন জমি-খেতগুলোকে ব্যক্তিগত মালিকানা থেকে মুক্ত করে জাতীয় মালিকানায় পরিণত করা আবশ্যক, কোনো দিক থেকে আবার সমগ্র ভারী শিল্পকে জাতীয়করণের ধ্বনি উত্থিত হয়, কোনো অনভিজ্ঞ 'ডাক্তার' সদ্য আবার গভীর চিন্তা-গবেষণা করে জমির উপর থেকে ব্যক্তিগত মালিকানা খতম করার অপূর্ব নোসখা পেশ করে, এসব কিছুই পাশ্চাত্য দেশের আনাড়ী চিন্তাবিদদের 'রাফখাতা' থেকে চুরি করে আনা হয়েছে মাত্র। এখন এখানে ঠিক সেসব পরীক্ষামূলক পরিকল্পনা কার্যকরী করার চেষ্টা হচ্ছে, যা ইতিপূর্বে রাশিয়া, জার্মানী, ইটালী, আমেরিকা

ও ইংল্যাণ্ডে করা হয়েছে। কিন্তু এ ব্যাপারেও আমাদের সাথে তাদের সাদৃশ্যে এক পার্থক্য বর্তমান রয়েছে। সেই দেশের আনাড়ি লোকেরাও স্বাধীন চিন্তাশীল ! কিন্তু আমাদের দেশের হোমড়া-চোমড়ারা শুধু ঔষধের দোকান খুলে বসে আছে মাত্র। তারা যেমন আনাড়ি, তেমনি তাদেরই অন্ধ অনুসরণ ও অনুকরণকারী। পাশ্চাত্য দেশের আনাড়ি লোকেরা ক্ষতি হতে দেখলে মূল তালিকারই রদ-বদল করে নিবে। এখানে সেই দেশ থেকে কোনো পরিবর্তনের সংবাদ আসলে অবশ্য স্বতন্ত্র কথা, অন্যথায় ডাক্তারগণ রোগীর শেষ মুমূর্ষু অবস্থা পর্যন্ত সেই একই তালিকা অনুযায়ী ঔষধ খাওয়াতে থাকবে। তাতে একবিন্দু রদ-বদল করার প্রয়োজনবোধ করবে না।

পাশ্চাত্য সমাজ, সভ্যতা তামাদ্দুন এবং চিন্তা-গবেষণা ও কার্যক্রমে ইতিহাসের আর একটি ব্যাপার খুবই প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। এক কথায় সেই ইতিহাস অবিশ্রান্ত দ্বন্দ্ব-সংগ্রাম, টানা-হেঁচড়া, ঝগড়া-বিবাদ ও যুদ্ধ-বিগ্রহের ইতিহাস। একটি দল জীবন ক্ষেত্র অধিকার করে নৈতিকতা, ধর্ম, আইন, রসম-রেওয়াজ এবং সমাজ ও তামাদ্দুনের সামগ্রিক ব্যবস্থাকে একটি বিশেষ দিকে টেনে নিয়ে যেতে শুরু করে। ফলে অপর দলের প্রতি চরম অবিচার না-ইনসাফীর পরাকাষ্ঠা করে ছাড়া হয়। পরে এ মজলুম দলসমূহের মধ্যে কেউ মাথাচাড়া দিয়ে উঠে এবং যালেমদের সাথে দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের সৃষ্টি করে। তার মন্দ কাজসমূহের সাথে সাথে ভাল কাজগুলোর গুরুত্বও স্পষ্টভাবে অস্বীকার করে বসে এবং চিন্তা-গবেষণা ও কাজের সমগ্র ব্যবস্থাকে প্রথম চূড়ান্ত দিক থেকে ফিরিয়ে এনে অপর প্রান্তে পৌঁছে দেয়। ফলে যুলুম না-ইনসাফীর চূড়ান্ত পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। অতপর অভিযোগ ও আক্রমণের পর্যায় অতিক্রম করে এক তৃতীয় বিদ্রোহের সৃষ্টি হয়। হিংসা-দ্বেষ ও জিদ-একগুয়েমীর স্রোত মিথ্যার সাথে সাথে সত্যকেও ভাসিয়ে নিয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত পূর্ববর্তীদের অপেক্ষাও অধিক ও চরম পর্যায়ের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। এ স্রোত ও সয়লাবের প্রচণ্ডতা এবং প্রলয়ংকর ধ্বংসকারিতা দেখে তার বিপরীত দিকে আর একটি প্রতিঝড়ের সৃষ্টি হয়। তারাও পূর্ববর্তীদের অপেক্ষা কিছুমাত্র কম চরমপন্থী হয় না। এ টানা-হেঁচড়ার দরুন পাশ্চাত্যের ইতিহাসকে এমনভাবে অগ্রসর হতে দেখা যায়, যেন একজন মদ্যপায়ী ব্যক্তি স্খলিত চরণে বাঁকা চোরাভাবে পথ অতিক্রম করছে, কোনো সচেতন ও সুস্থ বিবেকসম্পন্ন মানুষের মতো সমান্তরাল দৃঢ়পদে চলে না। হেগেল ও মার্কস এ দৃশ্য দেখে মনে করে বসেছেন যে, মানবীয় সভ্যতা তামাদ্দুনের ক্রমবিকাশের স্বাভাবিক ধরন বুঝি এ রকমই ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এসব কিছুই একটিমাত্র জিনিসেরই পরিণাম ফল এবং তা এই

যে, পাশ্চাত্যবাসীগণ দীর্ঘকাল থেকে আল্লাহর বিধান ও আল্লাহর আলো ছাড়া জীবনযাপন করছে। সেন্টপলের মাধ্যমে যে খৃস্টান মতবাদ তারা পেয়েছিল, তা মূল শরীয়াত থেকে পূর্বেই বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। তাদের নিকট হযরত ঈসা আ.-এর কয়েকটি মূল্যবান উপদেশমূলক কথা ছাড়া আল্লাহর হেদায়াতের কোনো অংশ আদপেই বর্তমান ছিল না। ফলে তাদের তামাদ্দুন, অর্থনীতি ও রাজনীতি বিরাট বিশাল প্রাসাদ নির্মাণের জন্য কোনো আল্লাহর বুনিয়াদ বর্তমান ছিল না। বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্ট-এর শতকরা দু' ভাগ আল্লাহর বিধানের সাথে শতকরা ৯৮ ভাগ মানুষের মনগড়া কথা শামিল হয়েছিল। এ কারণে পরবর্তীকালে যদি তারা আধা-বিশ্বাস ও আধা-অবিশ্বাসসহ তার দিকে আকৃষ্ট হয়ে থাকে, তবুও তারা তা থেকে বিশেষ পথনির্দেশ লাভ করতে সমর্থ হয়নি। রোমান সাম্রাজ্য চূর্ণ-বিচূর্ণ হওয়া অব্যবহিত পরেই এবং মধ্যযুগীয় অন্ধকারের সূচনাতেই ইউরোপের সামনে ইসলাম উপস্থাপিত হয়েছিল ; কিন্তু যে ইউরোপ শরীয়াতের বাঁধনমুক্ত হওয়ার শর্তে খৃস্টান ধর্মগ্রহণ করতে রাযী হয়েছিল, তাদের পক্ষে হেদায়াত লাভের উদ্দেশ্যে ইসলামের দিকে কিছুমাত্র আকৃষ্ট ও অগ্রসর হওয়া সম্ভব ছিল না। কেননা ইসলাম শরীয়াতকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র দীন ও ঈমান পেশ করতে আদৌ প্রস্তুত নয়। এ কারণে কিছুটা এবং কিছুটা খৃস্টান পাদ্রীদের প্রক্ষিপ্ত হিংসা-দ্বেষের কারণে ইউরোপ ইসলামের দিক-প্লাবী আলো গ্রহণ করতে সমর্থ হলো না। অতপর শুধু নিজেদের বুদ্ধি-বিবেক থেকেই নিজেদের জন্য জীবন পদ্ধতি ও ব্যবস্থা রচনা করা ভিন্ন ইউরোপবাসীদের পক্ষে আর কোনো উপায়ই ছিল না। আর কার্যত তারা এটাই করেছে ; কিন্তু মানুষ খালেছভাবে কোনো বুদ্ধিভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে আদৌ সমর্থ হয় না। তার বুদ্ধির সাথে লালসার বিভ্রান্তকারী শয়তানও যে নিরন্তর লেগেই থাকে তা সুস্পষ্ট ও সর্বজনবিদিত। আর এটাও কারো অজ্ঞাত নয় যে, সমগ্র মানুষ একত্রিত হয়ে কোনো জীবনব্যবস্থা রচনা করে না। কিছু সংখ্যক মেধাবী ও জাগ্রতমনা লোকই জীবনপদ্ধতি রচনা করে থাকে। এর কারণে তাদেরই মত বিদ্বেষ ভাবধারা সম্পন্ন লোকদের নিকটই এ জীবনপদ্ধতি মনমত ও গ্রহণযোগ্য হতে পারে। ঠিক এ কারণে ইউরোপে সময় সময় যেসব জীবনব্যবস্থা ও পদ্ধতি রচিত হয়েছে, তা সবই ভারসাম্যহীন। আর এ ভারসাম্যহীনতার অনিবার্য ফলে সেই দেশে ক্রমাগত দ্বন্দ্ব-সংগ্রাম ও টানা-হেঁচড়া প্রচণ্ডভাবে চলছে।

কিন্তু বাস্তবিকই এ দুনিয়ায় আমাদেরকে কোনো প্রকার পথপ্রদর্শন ও চিন্তা-বিশ্বাস, প্রকৃত জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং জীবনযাপন পদ্ধতি সম্পর্কে মূর্খতা-

অজ্ঞানতার ধুম্রজাল বিদূরণকারী কোনো গ্রন্থ আদৌ দান করা হয়নি। প্রাচীন হিন্দুদের জাহেলিয়াতে, মধ্যযুগের হেগেলীয় শাসন ব্যবস্থা ও আধুনিককালের পশ্চিমী সভ্যতা ও তামাদ্দুন মিলিত ও একত্রিত-সংমিশ্রিত হয়ে আমাদেরকে যেসব জটিল সমস্যার সম্মুখীন করে দিয়েছে, তা সমাধান করার জন্য পশ্চিমী দেশগুলোতেও কমিউনিজম, নাজীবাদ, ফ্যাসীবাদ ও পুঁজি তন্ত্র যেসব উপায় ও পন্থা অবলম্বন করেছে আমাদেরকেও কি তাই গ্রহণ করতে হবে ? তাছাড়া কি আমাদের কোনোই গত্যন্তর নেই। ... আমাদের নিকট কি সত্যই এমন কোনো আলোক মশাল বর্তমান নেই, যার সাহায্যে আমরা কোনো সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবনব্যবস্থা রচনা করে নিতে পারি ?

ইসলাম সম্পর্কে যার একবিন্দু ধারণা ও জ্ঞান আছে, উক্ত প্রশ্নের জবাবে সে কখনোই হ্যাঁ বলতে পারে না।

প্রকৃত সমস্যা—প্রকৃত জটিলতা

ইসলামী আদর্শ ও মূলনীতির ভিত্তিতে এসব সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান আমরা কিভাবে করতে পারি। একথা বুঝার জন্য পূর্বেই আমাদের সুস্পষ্টরূপে বুঝে নিতে হবে যে, বর্তমান সময়ে দুনিয়া এবং দুনিয়ার অধিবাসী হিসাবে আমরা প্রকৃতপক্ষে কোন্ সমস্যা, কোন্ জটিলতার সম্মুখীন হয়েছি। সংক্ষেপে সেই জটিলতা—সেই সমস্যার স্বরূপ এই ঃ

যে অর্থব্যবস্থার দৃষ্টিতে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ ইচ্ছা ও বাসনা অনুযায়ী উৎপাদন উপায়সমূহ অবাধে করায়ত্ত করতে পারে, যেভাবে ইচ্ছা নিজ মুনাফার ভাণ্ডার কানায় কানায় ভরে নেবার জন্য চেষ্টা ও সাধনা করতে পারে এবং যার দৃষ্টিতে সমাজে সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণতা প্রতিষ্ঠার জন্য কেবল প্রতিযোগিতা ও ভাংগা-গড়ার আপত্তি, গড়া আইন-কানুনের উপর একান্তভাবে নির্ভর করতে হয়, আমরাও যদি তাই অবলম্বন করি তাহলে তার পরিণামে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার উপরে আরোপিত সবরকমের দোষ-ক্রুটির উদ্ভব হওয়া অবশ্যম্ভাবী এবং আমাদের সমাজে জায়গীরদারী ব্যবস্থার পূর্বালোচিত সকল প্রকার দোষ-ক্রুটি অনিবার্যরূপে মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে।[১]

পক্ষান্তরে আমাদের ব্যক্তিগত মালিকানার নীতি যদি বাতিল করে দেই এবং তদস্থলে সমগ্র উৎপাদন উপায়কে জাতীয় মালিকানা কর্তৃত্বের অধীন করি তাহলে এ দোষগুলোর অধিকাংশ অবশ্যই দূরীভূত হয়ে যায় ; কিন্তু প্রথম কথা এই যে, এ মৌলিক পরিবর্তন জান-মালের অপরিমেয় বরবাদী

---

১. আধুনিক পুঁজিবাদ শীর্ষক প্রবন্ধে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

(ধ্বংস) এবং ঠিক রাশিয়ার মতোই ধর্ম ও নৈতিকতার বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা ছাড়া তা কিছুতেই সম্ভবপর হতে পারে না। দ্বিতীয়ত, যদি ধরেও নেয়া যায় যে, এ কাজ খুবই শান্তিপূর্ণ ও নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সম্ভব হবে, তবুও এতে তো কোনোই সন্দেহ থাকতে পারে না যে, জাতীয় মালিকানা ও সর্বাত্মক নীতি (সমাজবাদ) ব্যক্তিদের আযাদী সম্পূর্ণরূপে খতম করে দেয়। নিয়মতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক পন্থায় সমাজতন্ত্র কায়েম করা প্রকৃতপক্ষে গণতন্ত্রের সাহায্যে গণতন্ত্রের চূড়ান্ত অবসানের শামিল। কেননা গণতন্ত্রকে সুষ্ঠুরূপে চলতে হলে সেই জন্য সমাজ ও জাতি বিপুল সংখ্যক লোকের স্বাধীন উপার্জনশীল হওয়া একান্তই অপরিহার্য। কিন্তু সমাজতন্ত্রে এর সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থারই উদ্ভব হয়ে থাকে, সেখানে স্বাধীন পেশা ও জীবিকার অধিকারী সকল মানুষকেই চিরতরে বঞ্চিত করা হয়। বস্তুত অর্থব্যবস্থার যে বিভাগকেই জাতীয় মালিকানার অধীন করে দেয়া হবে, তার সমস্ত কর্মচারীই ঠিক সরকারী চাকুরীজীবীর মতো হবে। প্রত্যেক দেশের সরকারী কর্মচারীগণ মত প্রকাশ ও কর্মের যে কতটুকু আযাদী লাভ করে থাকে, তা কারোই অজ্ঞাত নয়। অর্থনীতির ক্ষেত্রে এ কর্মনীতি যতই পরিবর্তিত ও সম্প্রসারিত হতে থাকবে, চিন্তা, কথা, সভা, সংগঠন করা, লেখা-রচনা প্রকাশ এবং কর্মের আযাদীর পরিধি যে ততই সংকোচিত ও সংকীর্ণতর হয়ে আসবে তাতে কোনোই সন্দেহ থাকতে পারে না। ক্রমশ যেদিন সমগ্র অর্থব্যবস্থাই জাতীয়করণ করা সম্পূর্ণ হবে, ঠিক সেই দিন দেশের সমগ্র বাসিন্দাই সরকারী কর্মচারীতে পরিণত হবে। আর এ ধরনের সামগ্রিক ব্যবস্থার স্বভাব ও প্রকৃতিই এরূপ যে, যে দলই একবার ক্ষমতাসীন হয়ে বসবে, তাকে ক্ষমতাচ্যুত করা আর কখনোই সম্ভব হয়ে উঠবে না।

ব্যক্তিগত মালিকানা সমন্বিত অর্থব্যবস্থা খতম করার পরিবর্তে তার উপর যদি এক সুদৃঢ় সরকারী নিয়ন্ত্রণ (Government Control) বসিয়ে দেই এবং সমগ্র জাতীয় অর্থব্যবস্থাকে এককেন্দ্রীয় পরিকল্পনা অনুযায়ী পরিচালনা করি, ফ্যাসিবাদ ও নাৎসীবাদে যেমন রয়েছে—তাহলে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অনেক প্রকারের দোষ-ক্রটিরই প্রতিবিধান হয়ে যায় ; কিন্তু ব্যক্তি স্বাধীনতার পক্ষে এতটুকু নিয়ন্ত্রণও মারাত্মক প্রমাণিত হতে পারে। তার ফল কার্যত সমাজতন্ত্রেরই অনুরূপ হবে, তা নিসন্দেহ।

কিন্তু পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থাকে তার মূল বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত রেখে তাতে যদি কিছু পরিমাণ সংশোধনী আরোপ করে নেই—যেমন আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে এখন পর্যন্ত চালু রয়েছে—তাতে গণতন্ত্র ও ব্যক্তিগত মালিকানা হয়তো বহাল থাকবে, কিন্তু ঠিক যেসব বড় বড় কারণে পুঁজিবাদী

অর্থব্যবস্থা বিশ্বের পক্ষে এক কঠিন বিপদ—এক মহা অভিশাপে পরিণত হয়েছে, তার একটিও দূর হয়ে যাবে না।

অন্য কথায় একদিকে যদি বিরাট কূপ মুখব্যাদান করে রয়েছে, তবে ঠিক অপরদিকে রয়েছে বিরাট খাঁদ। সামগ্রিক কল্যাণের ব্যবস্থা গ্রহণ করলে ব্যক্তির আযাদী খতম হয়ে যায়। আর ব্যক্তির স্বাধীনতা যদি রক্ষা হয়, তাহলে সামগ্রিক কল্যাণ ব্যাহত হয়—চুরমার হয়ে যায়। পৃথিবী এমন কোনো জীবনব্যবস্থা লাভ করতে পারলো না, যার অধীন শিল্পবিপ্লব তার সমগ্র অবদান ও শুভ ফলসহ যথাযথভাবে চলতে থাকবে, ক্রমবৃদ্ধি লাভ করতে থাকবে এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও সামগ্রিক সামাজিক কল্যাণ উভয়ই এক সাথে একই সময় পূর্ণ ভারসাম্য সহকারে কার্যকরী হতে থাকবে। বস্তুত এরূপ একটি জীবনব্যবস্থা লাভের উপরই দুনিয়ার ভবিষ্যত নির্ভর করে। তা যদি বাস্তবিকই লাভ করা সম্ভব না হয় তাহলে শিল্প-বিপ্লবের পিস্তল দ্বারাই দুনিয়ার মানুষ আত্মহত্যা করবে। আর যদি তা বাস্তবিকই পাওয়া যায়, তাহলে যে দেশই তার এক সার্থক রূপ দুনিয়ার সামনে পেশ করতে পারবে, সেই রাষ্ট্রই হবে ভবিষ্যত দুনিয়ার অবিসংবাদিত নেতা।

❒

ইসলামী অর্থব্যবস্থার মূলনীতি

ইসলাম কমিউনিজম ও পুঁজিবাদের মধ্যবর্তী এক অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এ পরিকল্পনানুযায়ী এক সমাজ-প্রাসাদ নির্মাণের জন্য ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে কতকগুলো নৈতিক ও বাস্তব কাজের বুনিয়াদ স্থাপিত করে, যেন এ বুনিয়াদ ইসলামী অর্থনীতির এ প্রাসাদ নিজ বক্ষের উপর সুদৃঢ়রূপে ধারণ করতে সমর্থ হয়। এ উদ্দেশ্যে সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির মন-মগজ সুষ্ঠুরূপে গড়ে তোলে এবং তাতে সঠিকরূপে এমন এক ভাবধারার সৃষ্টি করতে চেষ্টা করে, যা এ সামঞ্জস্যপূর্ণ অর্থব্যবস্থা পরিচালনাকারীদের মধ্যে একান্তই অপরিহার্য। ব্যক্তিদের উপর ইসলাম কতগুলো কর্মসীমা ও বাধ্যবাধকতা আরোপ করে, যেন তা সামগ্রিক স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর না হয়ে ইতিবাচকভাবে তা কল্যাণকর ও সাহায্যকারী হতে পারে। সমাজেও ইসলাম এমন কতগুলো নিয়ম-নীতি নির্ধারণ করে, যা অর্থনৈতিক জীবন নষ্টকারী কারণসমূহ দূর করে দেয়।

বস্তুত আধুনিক অর্থনৈতিক জটিলতা দূর করার জন্য ইসলাম যে সমাধান পেশ করেছে, তা সঠিকরূপে হৃদয়ংগম করার জন্য ইসলামী অর্থব্যবস্থার উপরোক্ত মৌলিক নীতিসমূহ অনুধাবন করা একান্ত আবশ্যক।

এক ঃ অর্থোপার্জন উপায়ের মধ্যে জায়েয নাজায়েযের পার্থক্য

সর্বপ্রথম বিষয় এই যে, ইসলাম তার অনুসারীদেরকে অর্থ-সম্পদ উপার্জনের জন্য অবাধ উন্মুক্ত সুযোগ করে দেয়নি। বরং উপার্জনের উপায় ও পন্থার মধ্যে জাতীয় ও সামগ্রিক স্বার্থের দৃষ্টিতে জায়েয-নাজায়েয বৈধ-অবৈধের পার্থক্য সূচিত করেছে। এ পার্থক্যের একটি বিশেষ মূলনীতি রয়েছে ঃ তা এই যে, অর্থোপার্জনের যেসব পন্থা ও উপায়ে এক ব্যক্তির লাভ অপর ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের ক্ষতি হয় তা সবই নাজায়েয ঘোষিত হয়েছে। আর যাতে মুনাফা ও কল্যাণ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে ইনসাফপূর্ণ বাটোয়ারা হয় তা সবই বৈধ ও সংগত। কুরআন মজীদে এ মূল নীতিটি নিম্নোক্তভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ قف وَلاَ تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ○ وَمَنْ
يَّفْعَلْ ذٰلِكَ عُدْوَانًا وَّظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيْهِ نَارًا ط ـ النساء : ٢٩ـ٣٠

"হে ঈমানদার লোকগণ! পরস্পরে অবৈধ উপায়ে একে অপরের ধন ভক্ষণ করো না। সব রকমের লেনদেন হতে হবে পারস্পরিক সন্তোষ ও মর্জী অনুসারে। এবং তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে হত্যা করো না। আল্লাহ নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতি অনুগ্রহশীল। যে কেউ স্বীয় কর্মসীমা লংঘন করে যুলুম সহকারে এরূপ কাজ করবে, তাকেই আমি জাহান্নামে নিক্ষেপ করবো।"–সূরা আন নিসা ঃ ২৯-৩০

এ আয়াতে পারস্পরিক লেনদেনের কাজ দুটি শর্তে সংগত হতে পারে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। একটি এই যে, যাবতীয় লেনদেন, পারস্পরিক সন্তোষ ও রেযামন্দীর ভিত্তিতে সম্পূর্ণ হতে হবে। আর দ্বিতীয় এই যে, সেই লেনদেন যেন একজনের ফায়দা ও স্বার্থ রক্ষা এবং অপরের ক্ষতি ও অকল্যাণ না হয়। এ অর্থের দৃষ্টিতে "তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে হত্যা করো না।" বাক্যাংশ বড়ই অর্থ ও উচ্চভাবপূর্ণ। এর দুটি অর্থ হতে পারে। এ দুটি অর্থই এখানে লক্ষভূত রয়েছে ঃ প্রথম এই যে, তোমরা একজন অপরজনকে হত্যা করো না। আর দ্বিতীয় এই যে, তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে ধ্বংস করো না। অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজ স্বার্থের জন্য অপরের ক্ষতি সাধন করে, সে যেন তার রক্ত পান করছে এবং পরিণামে সে তার নিজের চূড়ান্ত ধ্বংসের পথ খোলাসা করছে। চুরি, ঘুষ-রিশওয়াত, জুয়া, ধোঁকা-প্রতারণা, সুদ এবং ইসলামে নিষিদ্ধ সকল প্রকার ব্যবসায়েই অবৈধ হওয়ার এ দুটি কারণ পূর্ণ মাত্রায় বর্তমান। কোনো কোনো ক্ষেত্রে পারস্পরিক রেযামন্দী থাকার কিছুটা অবকাশ হলেও আয়াতে উল্লিখিত 'নিজেদেরকে নিজেরা হত্যা করো না' বাক্যাংশের অপর শর্তগুলো সেখানে বর্তমান নেই (বরং তাতে আত্ম ধ্বংসের কারণ ঘটে)।

দুই ঃ ধন-সম্পদ সঞ্চয়ের নিষেধ

দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ আদেশ এই যে, বৈধ উপায়ে যে ধন-সম্পদ উপার্জন করা হবে, তা সঞ্চয় করে পুঁজিকৃত করা যাবে না। কেননা তাতে ধন-সম্পদের আবর্তন রুদ্ধ হয়ে যায় এবং ধন-সম্পদের বন্টন ও বিস্তারে সামঞ্জস্য রক্ষিত হতে পারে না। ধন-সম্পদ সঞ্চয় ও পুঁজিকৃত করে কেবল নিজেই মারাত্মক রকমের নৈতিক ব্যধিতে আক্রান্ত হয় না, প্রকৃতপক্ষে সে সমগ্র

মানব সমাজের বিরুদ্ধে একটি কঠিন অপরাধ করে। এর পরিণামে তার নিজের চরম দুর্ভাগ্য সূচিত হয়। এজন্যই কুরআন কার্পণ্য ও কারুন নীতির কঠোর বিরোধী। কুরআন বলছে ঃ

وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ط بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ط - ال عمران : ١٨٠

"যারা আল্লাহ প্রদত্ত অনুগ্রহে কৃপণতা করে, তারা যেন একথা মনে না করে যে, তাদের এ কাজ তাদের পক্ষে খুব কল্যাণজনক হবে। বরং প্রকৃতপক্ষে এটা তাদের পক্ষে খুব খারাপ।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ১৮০

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُوْنَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لا فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۝ - التوبة : ٣٤

"যারা স্বর্ণ রৌপ্য (টাকা-পয়সা) সঞ্চয় করে রাখে, তাকে আল্লাহর পথে খরচ করে না, তাদেরকে কষ্টদায়ক আযাবের সংবাদ দাও।"
–সূরা আত তাওবা ঃ ৩৪

একথা পুঁজিবাদের মূলভিত্তির উপর কঠিন আঘাত হানে। উদ্বৃত্ত অর্থ সঞ্চয় করে রাখা এবং পুঁঞ্জিকৃত ধন-সম্পদকে অধিক ধন উৎপাদনের কাজে বিনিয়োগ না করাই হচ্ছে পুঁজিবাদের মূল মন্ত্র। কিন্তু ইসলাম প্রয়োজনাতিরিক্ত ধন-সম্পদ পুঁজি ও সঞ্চয় করে রাখা আদৌ পসন্দ করে না।

তিন ঃ ব্যয় বিনিয়োগের নির্দেশ

ধন-সম্পদ সঞ্চয় করে রাখার পরিবর্তে ইসলাম তা ব্যয় বিনিয়োগ করার নির্দেশ দেয়। কিন্তু ব্যয় করার আদেশের অর্থ কখনো এই নয় যে, মানুষ এ সুযোগে ব্যক্তিগত আয়েশ-আরাম ও বিলাস-ব্যসনে তথা লালসা চরিতার্থ করার কাজে টাকা উড়াবে। ব্যয় করার আদেশ 'আল্লাহর পথে' হওয়ার শর্তাধীন। অর্থাৎ যার নিকট স্বীয় প্রয়োজনের অতিরিক্ত যা কিছুই উদ্বৃত্ত থাকবে, তাই জাতি ও সমষ্টির কল্যাণের কাজে ব্যয় ও বিনিয়োগ করবে। কেননা এটাই হচ্ছে আল্লাহর পথ।

وَيَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ۝ قُلِ الْعَفْوَ ط - البقرة : ٢١٩

"লোকেরা তোমার নিকট জিজ্ঞেস করে, তারা কি খরচ করবে ? তুমি বলে দাও যে, যাকিছু প্রয়োজনাতিরিক্ত–উদ্বৃত্ত (তাই খরচ করো)।"
–সূরা আল বাকারা ঃ ২১৯

وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْۢبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ لا وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ط - النساء : ٣٦

"ভাল ব্যবহার করো তোমার পিতা-মাতার সাথে, নিকটাত্মীয়দের সাথে, ইয়াতীম ও অভাবী লোকদের সাথে, নিকটাত্মীয় প্রতিবেশী ও অনাত্মীয় প্রতিবেশী এবং সংস্পর্শের লোকদের সাথে, বন্ধু, পথিক ও দাস-দাসীদের সাথে।"–সূরা আন নিসা ঃ ৩৬

وَفِىْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ٥ - الذاريات : ١٩

"তাদের ধন-সম্পদে প্রার্থী ও অভাবী লোকদের হক-অধিকার রয়েছে।"–সূরা আয যারিয়াত ঃ ১৯

এ পর্যায়ে ইসলামের দৃষ্টিভংগী পুঁজিবাদী দৃষ্টিভংগী থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র—সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম।

পুঁজিদার মনে করে, ধন-সম্পদ ব্যয় করলে দারিদ্র্য অনিবার্য। আর তা সঞ্চয় করলেই অর্থশালী হওয়া সম্ভব। কিন্তু ইসলাম ঘোষণা করছে যে, ব্যয় করলেই বরকত হবে—সচ্ছলতা বৃদ্ধি পাবে ; সম্পদ ক্ষয় ও হ্রাসপ্রাপ্ত হবে না—তা উত্তরোত্তর বেড়ে যাবে।

اَلشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَاْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ ج وَاللّٰهُ يَعِدُكُمْ مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلاً ط - البقرة : ٢٦٨

"শয়তান তোমাকে দারিদ্র ও অভাবের ভয় দেখায় ও কার্পণ্য প্রভৃতি লজ্জাকর কাজে প্ররোচিত করে। কিন্তু আল্লাহ্ তোমাদের নিকট ক্ষমা ও অতিরিক্ত দানের ওয়াদা করছেন।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২৬৮

ইসলাম মনে করে, যা ব্যয় করা হয় তাই বিলুপ্ত হয় না, তার উত্তম কল্যাণ তোমার দিকেই ফিরে আসে।

وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ يُّوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لاَتُظْلَمُوْنَ٥ - البقرة : ٢٧٢

"নেক কাজে তোমরা যাকিছু ব্যয় করবে, তা তোমাদেরকে পুরোপুরিই ফিরিয়ে দেয়া হবে, তোমাদের উপর কখনোই যুলুম করা হবে না।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২৭২

وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلاَنِيَةً يَّرْجُوْنَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَ ۝ لِيُوَفِّيَهُمْ

اُجُوْرَهُمْ وَيَزِيْدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ط - فاطر : ٢٩-٣٠

"যারাই আমার দেয়া রিয্‌ক ধন-সম্পদ থেকে প্রকাশ্য ও গোপনে ব্যয় করে, যে এমন এক ব্যবসায়ের আশা পোষণ করে, যাতে কখনো লোকসান হতে পারে না। আল্লাহ্‌ তার বিনিময়ে তাদেরকে পূর্ণ মাত্রায় ফল দান করবেন।"–সূরা আল ফাতির ঃ ২৯-৩০

পুঁজিদারদের ধারণা এই যে, ধন-সম্পদ সঞ্চিত ও পুঁজিকৃত করে সুদী কারবারে বিনিয়োগ করলে তাতে যথেষ্ট মুনাফা লাভ হবে—সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। ইসলাম বলছে যে, তা সঠিক নয়, সুদী কারবারে বরং সম্পদ হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, সম্পদ বৃদ্ধির সঠিক উপায় হচ্ছে নেক কাজে তা ব্যয় করা।

يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِى الصَّدَقٰتِ ط - البقرة : ٢٧٦

"আল্লাহ্‌ সুদ নির্মূল করেন এবং দান সদকাকে ক্রমবৃদ্ধি দান করেন।"
–সূরা আল বাকারা ঃ ২৭৬

وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَا فِىْٓ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلاَ يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ ج وَمَآ

اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ ۝

"তোমরা এই যে সুদ দাও, এ আশায় যে, এর ফলে লোকদের ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পাবে, জেনে রাখো, আল্লাহ্‌র নিকট এটা কখনোই বৃদ্ধি পায় না। ক্রমবৃদ্ধি তো কেবল সেই ধন-সম্পত্তিতেই হয়ে থাকে, যা তোমরা আল্লাহ্‌র সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে যাকাত বাবদ দিয়ে থাকো।"–সূরা আর রূম ঃ ৩৯

বস্তুত এটা ইসলামের এক অভিনব মতাদর্শ, পুঁজিবাদী মতাদর্শের এটা সম্পূর্ণ বিপরীত। ব্যয় করার ফলে ধন-সম্পদের বৃদ্ধি লাভ ও ব্যয়িত অর্থ ধ্বংস না হওয়া—বরং পূর্ণ মাত্রায় তার অতিরিক্ত মুনাফা ও কল্যাণসহ লাভ করা ; পক্ষান্তরে সুদী কারবারের ধন-সম্পদের বৃদ্ধি না পাওয়া—তার পরিবর্তে ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়া যাকাত ও সদকার ফলে ধন-সম্পদের পরিমাণ কম হওয়ার পরিবর্তে বৃদ্ধি পাওয়া এমন এক ধরনের মতবাদ, যা বাহ্য দৃষ্টিতে বড়ই আশ্চর্যজনক বলে মনে হয় ; শ্রোতা এটা থেকে এ ধারণাই লাভ করে যে, সম্ভবত এসব কথা কেবলমাত্র পরকালীন সওয়াবের সাথেই সংশ্লিষ্ট। পরকালীন সওয়াবের সাথেও যে এর সম্পর্ক রয়েছে, তাতে

বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। ইসলামের দৃষ্টিতেই তার প্রকৃত মূল্য এবং গুরুত্ব, তাও সন্দেহহীন কথা ; কিন্তু একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই বুঝতে পারা যায় যে, এই শ্রেণীর মতাদর্শ দুনিয়ার অর্থনৈতিক দৃষ্টিতেও অত্যন্ত মজবুত ও দৃঢ় বুনিয়াদের উপর স্থাপিত। ধন-সম্পদ সঞ্চয় করা এবং তাকে সুদী কারবারে নিয়োগ করার ফলে ধন-সম্পদ বিন্দু বিন্দু করে মুষ্টিমেয় কয়েক ব্যক্তির নিকট পুঁঞ্জিভূত হওয়া এবং অধিক সংখ্যক অধিবাসীর ক্রয় ক্ষমতা (Purchasing Power) ক্রমশ হ্রাসপ্রাপ্ত হওয়া, শিল্প-বাণিজ্য ও কৃষি ক্ষেত্রে মন্দাভাব দেখা দেয়া, জাতির অর্থনৈতিক জীবন ধ্বংসোন্মুখ হওয়া এবং শেষ পর্যন্ত পুঁজিবাদের পক্ষে নিজের সঞ্চিত সম্পদ অর্থোৎপাদনের কাজে বিনিয়োগের সুযোগ বর্তমান না থাকা অবধারিত।[১]

ইসলামী অর্থব্যবস্থার পরিণাম এর বিপরীত। এ ব্যবস্থায় ধন-সম্পদ ব্যয় করার ও যাকাত-সাদকা দান করার পরিণতি এই যে, তার দরুণ জাতির প্রত্যেক ব্যক্তি পর্যন্ত এ ধন নিক্ষিপ্ত ও বিস্তৃত হয়ে পড়ে, প্রত্যেক ব্যক্তিই যথেষ্ট পরিমাণ ক্রয় ক্ষমতা লাভ করতে পারে। শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি পায়, ক্ষেত-খামার হয় শস্য-শ্যামল, ব্যবসায়-বাণিজ্য অপূর্ব পর্যায়ে উন্নতি লাভ করে। এ সমাজে কেউ লক্ষপতি যদি নাও হয়, তবু তাতে কোনো ক্ষতি নেই ; কেননা এখানকার সকলেই হবে সচ্ছল-স্বচ্ছন্দ, জীবন নিশ্চিন্ত, সুখী। এ শুভ পরিণাম সম্পন্ন অর্থনৈতিক মতাদর্শের সত্যতা অনুধাবন করতে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অধীন বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে; কেননা সেখানে কেবল সুদ প্রথার কারণেই সম্পদ বণ্টনের ভারসাম্য বিনষ্ট হয়েছে। শিল্প ব্যবসায়ের মন্দাভাব জনগণের অর্থনৈতিক জীবনকে ধ্বংসের মুখে পৌঁছে দিয়েছে। অপরদিকে দেখুন ইসলামী সমাজের প্রাথমিক যুগের অবস্থা। ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যখন সেখানে পূর্ণাংগ প্রতিষ্ঠিত হয় তখন মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই জনগণের আর্থিক সচ্ছলতা অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ে উন্নত হয়েছিল। সেখানে লোকেরা যাকাত গ্রহণের উপযোগী লোক সন্ধান করতে থাকতো। কিন্তু তা সত্ত্বেও এরূপ খুব কমই পাওয়া যেতো, যারা যাকাত দেয়ার উপযুক্ত নয়, যাকাত নেয়ার উপযুক্ত। এ দুটি পরস্পর বিপরীত অবস্থার তুলনামূলক পর্যালোচনা করলেই—আল্লাহ যে কিভাবে

১.এখানে একটি হাদীসের দিকে ইংগীত করা হয়েছে, নবী করীম স. বলেছেন ঃ

إن الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل

"সুদের পরিমাণ যাই হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত তার পরিমাণ কম হতে বাধ্য।"–ইবনে মাজাহ, বায়হাকী, আহমদ

"সুদকে ধ্বংস করেন ও যাকাত সাদকাকে ক্রমোন্নতি এবং ক্রমবিকাশ দান করেন" তা সুস্পষ্টরূপে বুঝতে পারা যায়।

ইসলাম জনগণের মধ্যে যে ধরনের মনোভাবের সৃষ্টি করে তা পুঁজিবাদী মনোবৃত্তির সম্পূর্ণ বিপরীত। এক ব্যক্তি নিজের টাকা অপরকে বিনা সুদে দেয়ার কথা পুঁজিদার ধারণা পর্যন্ত করতে পারে না। ঋণদানের বিনিময়ে সে কেবল সুদই গ্রহণ করে না, মূলধন ও সুদ উসূল করার জন্য সে ঋণ গ্রহণকারীর পরিধেয় ও তৈজষপত্র পর্যন্ত ক্রোক করে নিতে দ্বিধাবোধ করে না। কিন্তু ইসলামের শিক্ষা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। ইসলাম মানুষকে এ শিক্ষা দেয় যে, অভাবী ও প্রয়োজনশীলকে কেবল ঋণই দিবে না, সে যদি বাস্তবিকই সংকীর্ণ হাত হয়ে পড়ে তাহলে সেই ঋণ ফেরত চাইবার ব্যাপারে কিছুমাত্র কড়াকড়িও করো না। এমনকি, তার যদি তা ফিরিয়ে দেয়ার সামর্থই না থাকে তবে তাকে মাফ করে দাও।

وَاِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍ ط وَاَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○ - البقرة : ٢٨٠

"ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি সংকীর্ণ হাত হলে তার অবস্থা ভাল হওয়ার সময় পর্যন্ত তাকে অবকাশ দাও। আর তাকে যদি মাফই করে দাও, তবে তা তো তোমার জন্য অতি উত্তম কাজ। জ্ঞান থাকলে এর কল্যাণ তোমরা বুঝতে পারো।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২৮০

পুঁজিবাদী সমাজে পারস্পরিক সাহায্যের ব্যবস্থা আছে ; কিন্তু সেখানে তার পন্থা এই যে, সমবায় প্রতিষ্ঠানকে নিজে টাকা দিয়ে প্রথমে তার সদস্যভুক্ত হতে হয়। তারপর প্রয়োজন হলে এ সংস্থা একজন সদস্যকে সুদের প্রচলিত হার অপেক্ষা কম হারে টাকা ঋণ দিবে। নিজের নিকট টাকা না থাকলে এ ধরনের সমবায় প্রতিষ্ঠানের কোনো সাহায্যই কেউ লাভ করতে পারে না। ইসলামের 'পারস্পরিক সাহায্য' সম্পর্কিত ধারণা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। যারা সামর্থ ও সচ্ছল লোক তারা প্রয়োজনের সময় নিজেদের অপেক্ষা কম সামর্থ সম্পন্ন লোকদেরকে কেবল ঋণই দিবে না, ঋণ ফেরত দেয়ার ব্যাপারেও আল্লাহরই ওয়াস্তে তাদের সাহায্য করতে হবে। এজন্যই যাকাতের নির্দিষ্ট ব্যয়-ক্ষেত্রসমূহের মধ্যে একটি হচ্ছে 'আল-গা-রেমীন'—ঋণ-গ্রস্তদের ঋণ আদায় করা।

পুঁজিদার কোনো ভাল কাজে অর্থ ব্যয় করলেও তার পশ্চাতে লোক দেখানো ও সুনাম-সুখ্যাতি অর্জন প্রবল উদ্দেশ্যরূপে নিহিত থাকে। কেননা সংকীর্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির নিকট অর্থ ব্যয়ের বিনিময়ে অন্তত সুনাম, সুখ্যাতি, জনপ্রিয়তা, প্রভাব ও প্রতিপত্তি লাভ হওয়া অপরিহার্য ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে। কিন্তু ইসলাম নির্দেশ দিয়েছে যে, অর্থ ব্যয়ের ব্যাপারে কোনোরূপ লোক দেখানোপনার মনোভাব থাকা উচিত নয়। প্রকাশ্য কি গোপনভাবে যা কিছুই ব্যয় করবে, সাথে সাথেই কোনো না কোনোরূপে তার বিনিময়ে লাভ তোমার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নয়। বরং তোমাদের দৃষ্টিস্থাপন করতে হবে কাজের পরিণামের উপর। ইহকাল থেকে পরকাল পর্যন্ত তোমাদের দৃষ্টি যতদূর পৌঁছায়, দেখতে পাবে তোমাদের অর্থ ব্যয় ফুলে ফলে সুশোভিত হচ্ছে ও 'মুনাফার' পর মুনাফা লাভ করে যাচ্ছে। বস্তুত "যে স্বীয় ধন-সম্পদ কেবলমাত্র লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ব্যয় করে তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে এমন এক প্রস্তর ভূমি, যার উপর মাটি পড়েছে, তাতে বীজ বপন করা হয়েছে। কিন্তু পানির একটি স্রোত এসে সমস্ত মৃত্তিকার স্তর ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। কিন্তু যে ব্যক্তি স্বীয় নিয়ত ঠিক রেখে আল্লাহর সন্তোষ লাভের জন্য অর্থ ব্যয় করে, তাদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে এক উত্তম উর্বর ভূমিতে রচিত এক বাগান। বৃষ্টি পড়লে দ্বিগুণ ফল লাভ হয়, বৃষ্টি না হলেও 'বিন্দু বারি বর্ষণই' তার জন্য যথেষ্ট হয়।"

اِنْ تُبْدُوْا الصَّدَقٰتِ فَنِعِمَّا هِيَ ج وَاِنْ تُخْفُوْهَا وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَرَاۤءَ فَهُوَ
خَيْرٌ لَّكُمْ ط ـ البقرة : ٢٧١

"দান-সাদকা প্রকাশ্যভাবে করলে তাও ভাল ; কিন্তু যদি গোপনে করো এবং গরীব লোকদের পর্যন্ত তা পৌঁছাও, তবে তা তোমাদের জন্য অতি উত্তম কাজ হবে।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২৭১

পুঁজিদার নেক কাজ কিছু করলেও তা করে নিতান্ত অনিচ্ছুকভাবে, নিকৃষ্টতম মাল দিয়ে নিষ্কৃতি পেতে চেষ্টা করে। আর যাকে কিছু দেয়, তার অর্ধেক জান কবয করে ফেলে তার তিক্ত রসনা চর্চার মাধ্যমে। ইসলাম তা কিছুমাত্র সমর্থন করে না। ইসলাম মানুষকে উত্তম ও উৎকৃষ্টতর মাল আল্লাহর জন্য ব্যয় করতে বলে এবং কাউকেও কিছু দিয়ে তার উপর স্বীয় অনুগ্রহের দোহাই দিতে নিষেধ করে। এমনকি তোমার দানের অনুগ্রহ পেয়ে কেউ তোমার নিকট অনুগৃহীত হওয়ার কথা প্রকাশ করুক, মনে মনে এরও কামনা করা সম্পূর্ণ অনুচিত।

اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ ص وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ○ - البقرة : ٢٦٧

"তোমরা যাকিছু উপার্জন করেছো, আর যাকিছু আমি তোমাদের জন্য যমীন থেকে উৎপন্ন করেছি, তা থেকে উত্তম জিনিস আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করো। বেছে বেছে নিকৃষ্ট জিনিস থেকে ব্যয় করো না।"

–সূরা আল বাকারা ঃ ২৬৭

لَاتُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى ٧ - البقرة : ٢٦٤

"তোমাদের দান-সাদকাসমূহ অনুগ্রহের দোহাই দিয়ে এবং অনুগৃহীত ব্যক্তিকে কষ্ট দিয়ে বিনষ্ট ও নিষ্ফল করে দিও না।"

–সূরা আল বাকারা ঃ ২৬৪

يُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّاَسِيْرًا○اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَانُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَآءً وَّلَا شُكُوْرًا - الدهر : ٨-٩

"তারা আল্লাহর ভালবাসার দরুন মিসকীন, ইয়াতীম ও বন্দীদের খাবার খাওয়ায়। আর তাদেরকে বলে যে, আমরা তো আল্লাহরই (সন্তোষের) জন্য তোমাদেরকে খাবার খাওয়াচ্ছি। আমরা তোমাদের নিকট থেকে কোনো প্রতিফল, পুরস্কার ও শুকরিয়া, কৃতজ্ঞতা লাভের আশা করি না।"–সূরা আদ দাহর ঃ ৮-৯

নিছক নৈতিকতার দৃষ্টিতে এ দুই ধরনের মনোবৃত্তির মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে, তার কথা না হয় না-ই বললাম, নিছক অর্থনৈতিক দৃষ্টিতেই বিচার করে দেখা যেতে পারে যে, লাভ ও ক্ষতির এ ধরনের দৃষ্টিভংগীর মধ্যে কোন্ মতাদর্শটি অধিকতর দৃঢ় ও সুদূর প্রসারী, পরিণামের হিসেবে অধিকতর সুষ্ঠু এবং নির্ভুল। পরন্তু লাভ-লোকসান ও ক্ষতি-উপকারের ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভংগী যখন তাই যা উপরে বর্ণিত হয়েছে, তখন কোনো না কোনোরূপে ইসলাম সুদী কারবারকে কি করে বরদাশত করতে পারে ? ... এটা সম্ভবই বা কিরূপে হতে পারে ?

চার ঃ যাকাত

পূর্বে যেমন বলেছি, ইসলামের লক্ষ এই যে, ধন-সম্পদ যে কোনো ক্ষেত্রেই একত্রীভূত ও পুঞ্জিভূত হয়ে না যায়। জাতির যেসব লোক নিজেদের

অপেক্ষাকৃত অধিক যোগ্যতা কিংবা সৌভাগ্যের দৌলতে প্রয়োজনাতিরিক্ত ধন-সম্পদ লাভ করতে পেরেছে, ইসলামের নির্দেশ এই যে, তারা যেন তা নিজেদের নিকট পুঁজিকৃত করে না রাখে। বরং তা ব্যয় করাই তাদের কর্তব্য। ব্যয় করতে হবে এমনসব ক্ষেত্রে ও খাতে, সেখান থেকে সম্পদের আবর্তনের ফলে সমাজের কম ভাগ্যবান ব্যক্তিরা যথেষ্ট পরিমাণ সম্পদ লাভ করতে পারে। এ উদ্দেশ্যে ইসলাম একদিকে নৈতিক শিক্ষা, উৎসাহ দান ও ভীতি প্রদর্শনের কার্যকরী হাতিয়ার প্রয়োগ করে বদান্যতা ও প্রকৃত পারস্পরিক সাহায্যের আন্তরিক ভাবধারা সৃষ্টি করতে চায়। যেন লোকেরা নিজেদের স্বাভাবিক ঝোঁকপ্রবণতার ফলেই ধন-সম্পদ সঞ্চয় করে রাখাকে অন্তরের সাথে ঘৃণা করে এবং তাকে ব্যয় করার দিকেই হয় অধিক উৎসাহী ও আগ্রহী। অপরদিকে ইসলাম কতগুলো আইন-কানুনও পেশ করেছে, বদান্যতার এ অপূর্ব শিক্ষা ও উপদেশ সত্ত্বেও যারা বক্র স্বভাবের প্রভাবে পড়ে অর্থ লুণ্ঠন ও সম্পদ সঞ্চয় কাজে অধিকতর অভ্যস্ত হয়ে পড়বে, অথবা যাদের নিকট ধন-সম্পদ কোনো না কোনোভাবে সঞ্চিত হবে, তাদের ধন থেকেও অন্তত একটি নির্দিষ্ট অংশ জনগণের কল্যাণের খাতে ব্যয় করার জন্য অবশ্যই বের করে নেয়া হবে, উল্লেখিত আইন-কানুনের মূল লক্ষ তাই। আর এটাই হচ্ছে 'যাকাত'। ইসলামের অর্থব্যবস্থায় যাকাত এতদূর গুরুত্বপূর্ণ যে, তাকে ইসলামের একটি রুকন—স্তম্ভরূপে গণ্য করা হয়েছে। সালাতের পরে পরেই এরই উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সুস্পষ্ট ভাষায় বলে দেয়া হয়েছে যে, যে ব্যক্তি ধন-সম্পদ সঞ্চয় ও সংগ্রহ করে, তা থেকে রীতিমত যাকাত আদায় না করা হলে তা কোনোক্রমেই হালাল হতে পারে না।

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا - التوبة : ١٠٣

"তাদের ধন-মাল থেকে যাকাত উসুল করো এবং তারই সাহায্যে তা পবিত্র ও হালাল করে তোলো।"–সূরা আত তাওবা ঃ ১০৩

যাকাত শব্দটি স্বতঃই প্রমাণিত হয় যে, ধনশালী ব্যক্তির নিকট যে সম্পদ সঞ্চিত হয়ে আছে, তা থেকে মালিক প্রতি বছর অন্তত শতকরা আড়াই ভাগ আল্লাহর পথে ব্যয় না করলে তা কখনোই তার জন্য হালাল হতে পারে না।

'আল্লাহর পথে' শব্দটির অর্থ কি ? আল্লাহ তো সকল প্রয়োজনের উর্ধে—মুখাপেক্ষীহীন। না কোনো মাল তাঁর নিকট পৌছায়, না তা তাঁর জন্য কিছুমাত্র প্রয়োজনীয়। তাঁর পথ এই যে, মালদার নিজের অর্থ ব্যয়ের সাহায্যে নিজেই গরীব ও অভাবগ্রস্ত লোকদেরকে সচ্ছল বানাতে চেষ্টিত হবে এবং এমন

কল্যাণকর কাজের উন্নতি বিধানে তা ব্যয় ও বিনিয়োগ করবে, যার কল্যাণ নির্বিশেষে গোটা জাতিই লাভ করতে সমর্থ হবে।

إِنَّمَا الصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَٰكِيْنِ وَالْعَٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِيْنَ وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ - التوبة : ٦٠

"সাদকা-যাকাত মূলত ফকীর-মিসকীনদের জন্য, সাদকা-যাকাত আদায় কাজে নিযুক্ত কর্মচারীদের জন্য, তাদের জন্য—যাদের মন আকর্ষণ করা উদ্দেশ্য হবে। বন্দীদশা থেকে লোকদের মুক্ত করার উদ্দেশ্যে, ঋণগ্রস্তদের জন্য, আল্লাহর পথে ব্যয় করার জন্য এবং মুসাফির—বিপদগ্রস্ত পথিকদের জন্য।"

বস্তুত এটাই হচ্ছে মুসলমানদের সমবায়—পারস্পরিক সাহায্য সংস্থা। আর এটাই তাদের 'জীবন বীমা'। এটা তাদের প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড-এরও কাজ করে থাকে। এটাই তাদের বেকার উপার্জনহীন লোকদের জন্য সঞ্চিত সাহায্য ফাণ্ড। তাদের অক্ষম, পংগু, লুলা, রুগ্ন, ইয়াতীম ও বিধবাদের লালন-পালনের উপায়। সর্বোপরি যাকাত এমন এক ব্যবস্থা যা একজন মুসলিমকে ভবিষ্যতের চিন্তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে। তার সহজ-সরল নিয়ম এই যে, তোমরা যারা এখন সম্পদশালী—অপর লোকদের সাহায্য করো। ভবিষ্যতে তোমরাও যদি দরিদ্র হয়ে পড়ো, তাহলে অপর লোকেরা তোমার সাহায্য করবে। গরীব হয়ে গেলে যে কি অবস্থা হবে, মরে গেলে স্ত্রী-পুত্রের কি দশা হবে, আকস্মিক কোনো বিপদ আসলে, রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লে, আগুনে ঘর-বাড়ী জ্বলে পুড়ে গেলে, বন্যায় ভেসে গেলে কিংবা দেউলিয়া হয়ে গেলে যে কি অবস্থা হবে—কিভাবে এ কঠিন বিপদসমূহের সাথে মুকাবিলা করা যাবে, বিদেশে পাথেয়হীন হয়ে পড়লেই বা কি অবস্থা দেখা দিবে—কিভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করা সম্ভব হবে, সেই সম্পর্কে কারো ভাবিত ও চিন্তা-ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ার কোনো প্রয়োজন নেই। কেননা এ সকল প্রকার চিন্তা-ভাবনা হতে একমাত্র যাকাতই মানুষকে নিষ্কৃতি দান করতে ও স্বীয়ভাবে নিশ্চিন্ত করে দিতে পারে। মানুষের কাজ শুধু এতটুকু যে, তারা নিজেদের সঞ্চিত ধন-সম্পদ হতে শতকরা আড়াই টাকা দান করে আল্লাহর জীবন বীমা কোম্পানীতে নিজের জন্য বীমা করে নিবে। কেননা এখন তো এ টাকা তোমার না হলেও চলতে পারো। এখন এটা অপরাপর অভাবগ্রস্ত লোকদের কল্যাণে ব্যয়িত হবে। আর ভবিষ্যতে তুমি নিজে যদি অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়ো কিংবা তোমার সন্তান-সন্ততি কঠিন অভাবে

পড়ে যায়, তবে কেবল তোমার দেয়া সম্পদই নয়, তার চেয়ে অনেক বেশী ফিরিয়ে দেয়া হবে।

এখানে আবার পুঁজিবাদ ও ইসলামের রীতিনীতি ও কর্মপদ্ধতির মধ্যে সামগ্রিক বিরোধ ও বৈষম্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। পুঁজিবাদের লক্ষ হচ্ছে ধন-সম্পদ সংগ্রহ-সঞ্চয় করা, তার আরো বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সুদ গ্রহণ যেন এসব লোকদের নিকট বিচ্ছিন্নভাবে বর্তমান ধন-সম্পদ একত্রীভূত হয়ে একস্থানে পুঁঞ্জিভূত হয়।

ইসলামের লক্ষ এর সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে আরোপিত। ইসলামের লক্ষ এই যে, প্রথমত ধন-সম্পদ এককেন্দ্রিক ও পুঁঞ্জিকৃতই হবে না। যদি হয়ই তবে তার সরোবর থেকে যাকাতের ঝর্ণাধারা প্রবাহিত করতে হবে। যেন চারপাশের যে শুষ্ক ও রুক্ষ খেত-খামার রয়েছে, তা পরিষিক্ত হতে পারে এবং চতুর্দিকের সমগ্র যমীনই যেন শস্য-শ্যামল ও ফুলে-ফলে ভরপুর হতে পারে। পুঁজিবাদী সমাজে ধন-সম্পদের বিনিময় অবরুদ্ধ, ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ ; কিন্তু ইসলামে তা মুক্ত, অবাধ ও অবারিত। পুঁজিবাদী সমাজের ধন-সম্পদে পুকুর থেকে পানি নিতে হলে আপনার 'পানি' সেখানে পূর্ব থেকে মওজুদ রাখতে হবে। অন্যথায় এক ফোঁটা পানিও কেউ সেখান থেকে পেতে পারে না ; কিন্তু ইসলামের পানি কেন্দ্রের নিয়ম-কানুন তার সম্পূর্ণ বিপরীত। সেখানে যার নিকট অতিরিক্ত পানি রয়েছে, তাকে তা পুকুরে ঢালতে হবে। আর তার প্রয়োজন যার হবে, সে সেখান হতে পানি গ্রহণ করবে। এ দুটি ব্যবস্থা ও পন্থা যে মূল ও প্রকৃতির দিক দিয়েই পরস্পর বিরোধী এবং একই অর্থব্যবস্থায় এ দুটি জিনিস যে কখনোই একত্রিত হতে পারে না, তা সুস্পষ্ট।

পাঁচ ঃ মিরাসী আইন

নিজের প্রয়োজন পূরণ, আল্লাহর পথে ব্যয় ও যাকাত আদায় করার পরও যে ধন-সম্পদ কোনো স্থানে পুঁঞ্জিকৃত হবে, তাকে বিক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত করার উদ্দেশ্যে ইসলাম একটি বিশেষ পন্থা অবলম্বন করেছে। সেই বিশেষ পন্থাটি হচ্ছে 'মিরাসী আইন'। এ আইনের লক্ষ হচ্ছে ; পরিত্যক্ত সম্পত্তি—তার পরিমাণ কম হোক, কি বেশী—খণ্ড-বিখণ্ডিত করে নিকট ও দূরবর্তী আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়া, শ্রেণীমতে তাকে বণ্টন করে দেয়া। কারো কোনো উত্তরাধিকারী না থাকলে বা কোনো উত্তরাধিকারীর সন্ধান পাওয়া না গেলেও তাকে পালক পুত্র রেখে সম্পত্তিকে এককেন্দ্রিক করে রাখার অধিকার দেয়া যাবে না, তার সম্পত্তিকে মুসলমানদের বায়তুলমালে দাখিল

করে দেয়া হবে, যেন তা দ্বারা সমগ্র জাতির লোক উপকৃত হতে পারে। মীরাস বণ্টনের এ আইন ইসলামে যেরূপ রয়েছে, তেমন আর কোনো অর্থব্যবস্থায়ই বর্তমান নেই। দুনিয়ায় প্রচলিত অপরাপর অর্থব্যবস্থার লক্ষ হচ্ছে এক ব্যক্তি কিংবা কয়েক ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে,[১] কিন্তু ধন-সম্পদকে এককেন্দ্রিক ও পুঁজিভূত করে রাখা ইসলামের পসন্দ নয়। তাকে বিক্ষিপ্ত করা—বহু মানুষের মধ্যে তাকে ছড়িয়ে দিয়ে ধন-সম্পদের আবর্তন সহজতর করাই তার লক্ষ।

ছয় ঃ গনীমাত বা বিজিত সম্পদ বণ্টন

গনীমাতের মাল ও বিজিত সম্পদ-সম্পত্তি বণ্টনের ব্যাপারেও ইসলামের এ লক্ষ পূর্ণমাত্রায় কার্যকরী রয়েছে। ইসলামী যুদ্ধে যে ধন-সম্পদ সৈনিকদের হস্তগত হবে, সেই সম্পর্কে আইন করা হয়েছে যে, তা পাঁচটি অংশে বিভক্ত করা হবে। তার মধ্যে চার ভাগ সৈনিকদের মধ্যে বণ্টন করা হবে, এক অংশ সাধারণ জাতীয় কল্যাণের কাজে ব্যয় করার উদ্দেশ্যে বায়তুলমালে জমা করা হবে।

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى
وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ لا ـ الانفال : ٤١

"জেনে রাখো, তোমরা গনীমাতের যে মাল হস্তগত করেছো, তার এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহর, তাঁর রাসূলের, নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন ও অসহায় পথিকদের জন্য নির্দিষ্ট।"–সূরা আনফাল ঃ ৪১

আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল স.-এর অংশ বলতে সামাজিক উদ্দেশ্যে ও সামগ্রিক কল্যাণের জন্য নির্দিষ্ট অংশ বুঝা যায়। তা আল্লাহ্ ও রাসূল স.-এর বিধানানুযায়ী ইসলামী হুকুমাতের হাতে অর্পণ করা হয়।

রাসূল স.-এর নিকটাত্মীয়দের জন্য গনীমাত থেকে অংশ রাখার বিশেষ কারণ এই যে, যাকাত থেকে তাদেরকে কোনোই অংশ দেয়া হয়নি।

অতপর এই এক-পঞ্চমাংশের মধ্যেই আরো তিন শ্রেণীর অংশ বিশেষভাবে রক্ষিত হয়েছে ঃ

ক. জাতির ইয়াতীম শিশু, এটা থেকে তাদের শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। এটা তাদেরকে জীবন সংগ্রামের চেষ্টা-সাধনায় অংশগ্রহণের উপযোগী করে তুলার কাজে ব্যয় করা হবে।

---

১. জ্যেষ্ঠ পুত্রের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার আইন (Law of Primogeniture) ও একান্ন সংসার প্রথা (Joint Family System) -এর উদ্দেশ্যও এটাই।

খ. মিসকীন লোক, বিধবা, পংগু, অক্ষম, রুগ্ন ও অভাবী—সকল প্রকার লোক এর মধ্যে গণ্য।

গ. পথিক, বিদেশী লোক। ইসলাম স্বীয় নৈতিক শিক্ষার সাহায্যে লোকদের মধ্যে মেহমানদের খাতির করার বিশেষ ভাবধারা সৃষ্টি করে দেয়। এছাড়া যাকাত, সাদকা ও যুদ্ধলব্ধ গনীমাতের মালেও মুসাফির—পথিকদের অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। বস্তুত ইসলামে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক ব্যবস্থা। মুসলিম দেশগুলোতে ব্যবসায়, পর্যটন, শিক্ষা, অধ্যয়ন, স্মৃতিচিহ্ন ও অতীত নিদর্শন পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে লোকদের যাতায়াত এরই দৌলতে সহজতর হয়ে থাকে।

যুদ্ধের ফলে যেসব জমি-জায়গা ও মাল-সামগ্রী ইসলামী রাষ্ট্রের করায়ত্ত্ব হবে, তার সবকিছুকেই রাষ্ট্রের নিজস্ব অধিকারে রাখার জন্য বিশেষ আইন করা হয়েছে।

مَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ لا كَىْ لَايَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ اَغْنِيَآءِ مِنْكُمْ ط ... لِلْفُقَرَآءِ الْمُهَاجِرِيْنَ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ ... وَالَّذِيْنَ تَبَوَّءُ الدَّارَ وَالْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ ... وَالَّذِيْنَ جَآءُوْا مِنْ بَعْدِهِمْ ـ الحشر : ٧-١٠

"যেসব মাল-সামান আল্লাহ তাঁর রাসূলকে বস্তীর বাসিন্দাদের নিকট থেকে 'ফায়' হিসাবে দিয়েছেন, তা আল্লাহ, তাঁর রাসূল, রাসূলের নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকিন ও মুসাফিরদের জন্য রক্ষিত। .... উদ্দেশ্য এই যে, এ ধন-মাল যেন তোমাদের কেবল ধনী শ্রেণীর লোকদের মধ্যেই আবর্তিত হতে না থাকে। .... তাতে সেই অভাবগ্রস্ত মুহাজিরদের জন্যও অংশ রয়েছে, যাদেরকে তাদের ঘরবাড়ী ও বিত্ত-সম্পত্তি থেকে বেদখল করে নির্বাসিত করা হয়েছে। .... তাদের জন্যও তাতে অংশ রয়েছে, যারা মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে মদীনায় ঈমান গ্রহণ করেছিল। ভবিষ্যত বংশধরদের জন্যও তাতে অংশ রয়েছে, যারা পরে আগমন করবে।"–সূরা হাশর ঃ ৭-১০

উপরোক্ত আয়াতে 'ফায়' লব্ধ ধন-সম্পত্তি ব্যয়ের ক্ষেত্র সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, পরিষ্কার ভাষায় সেই উদ্দেশ্যও ব্যক্ত করা হয়েছে, যা কেবল 'ফায়' সম্পদ বণ্টনের ব্যাপারেই নয়, সমগ্র অর্থব্যবস্থায়ই ইসলামের সামনে সংস্থাপিত রয়েছে। আর তা হচ্ছে ঃ

كَيْ لَايَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ۔

"যাবতীয় ধন-সম্পদ যেন কেবল তোমাদের ধনীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে না থাকে।"–সূরা হাশর ঃ ৭

কুরআন মজীদে একথাটি খুব ছোট্ট বাক্যাংশেই বলা হয়েছে বটে ; কিন্তু তা সত্ত্বেও ইসলামী অর্থব্যবস্থা—প্রাসাদের তাই হচ্ছে ভিত্তিপ্রস্তর।

সাত ঃ মধ্যম নীতি অবলম্বনের নির্দেশ

ইসলাম একদিকে ধন-সম্পদকে জাতির অন্তরভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে আবর্তিত করার ও ধনীকদের ঐশ্বর্যে গরীবদেরকে অংশীদার বানাবার ব্যবস্থা করেছে, (পূর্বে এর বিস্তারিত বিবরণ পেশ করা হয়েছে) অপরদিকে ইসলাম প্রত্যেক ব্যক্তিকে অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে মধ্যম নীতি ও মিতব্যয়িতা অবলম্বন করার নির্দেশ দিয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, মিতব্যয়িতা ও অর্থ ব্যয়ের মধ্যম নীতি অবলম্বন করলে ব্যক্তিগণ তাদের আর্থিক উপায়-উপাদান ব্যবহার করার ব্যাপারে সংকীর্ণতা বা বাড়াবাড়ি—কৃপণতা বা অপচয় করে ধন বন্টনের ভারসাম্য নষ্ট করবে না। এ সম্পর্কে কুরআন মজীদের ব্যাপক শিক্ষা নিম্নোক্ত আয়াতে বর্ণিত হয়েছে ঃ

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً اِلٰى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوْمًا مَّحْسُوْرًا ۝- بنى اسرائي : ٢٩

"তোমার হাত গলার সাথে বেঁধে রেখো না। (কখনো খুলবেই না এমন যেন না হয়); তেমনি হাত একেবারে উন্মুক্তও করে দিও না। কেননা তা করলে পরে অনুতপ্ত ও হতাশাগ্রস্ত হয়ে বসে থাকতে বাধ্য হবে।"–সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ২৯

وَالَّذِيْنَ اِذَا اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا ۝

"আল্লাহর নেক বান্দাহ তারা, যারা অর্থ ব্যয়ের ব্যাপারে না অপচয় ও বেহুদা খরচ করে, না কোনোরূপ কৃপণতা করে। বরং তারা এ উভয় দিকের মাঝখানে মজবুত হয়ে চলে।"–সূরা আল ফুরকান ঃ ৬৭

কুরআনের এ শিক্ষার উদ্দেশ্য এই যে, প্রত্যেক ব্যক্তি যেন স্বীয় উপায়-উপার্জনের সীমার মধ্যে থেকে অর্থ ব্যয় করে। না কখনো সীমালংঘন করবে, আর না আয় অপেক্ষা অধিক ব্যয় করবে। এমনকি শেষ পর্যন্ত স্বীয় অযথা ব্যয়ের জন্য অপরের দ্বারে হাত প্রসারিত করতে বাধ্য হবে। অপরের রুযি-

রোযগার কেড়ে নিবে ও প্রকৃত প্রয়োজন ছাড়া লোকদের নিকট থেকে ঋণ গ্রহণ করবে। অথবা পরের টাকা ঋণ নিয়ে আদায় করবে না, কিংবা এতদূর ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়বে না যে, তা আদায়-উসুল করার জন্য স্বীয় সমস্ত আর্থিক উপায়-উপাদান ব্যয় করে নিজেরই কর্মফল হিসেবে নিজেকে গরীব মিসকীনদের পর্যায়ে শামিল করে দিবে, এটা অত্যন্ত মর্মান্তিক অবস্থা সন্দেহ নেই।

পক্ষান্তরে অত্যন্ত কৃপণ হওয়াও উচিত নয়। একজনের আর্থিক উপায়-উপাদান যতদূর ব্যয় করার অনুমতি দেয় ততখানিও ব্যয় না করা সম্পূর্ণ অনুচিত। পরন্তু নিজের আয়ের সীমার মধ্যে থেকে ব্যয় করার অর্থ এটা নয় যে, ভাল আয় করতে পারলে তার সমস্ত উপার্জনকে নিজের আয়েশ-আরাম ও জাকজমকের জন্য ব্যয় করবে। কেননা তার নিকটাত্মীয়, বন্ধু-বান্ধব ও প্রতিবেশী লোকগণ চরম বিপদের মধ্যে জীবনযাপন করবে; আর সে এরূপ বিলাস-ব্যসনে নিমগ্ন থাকবে—এরূপ স্বার্থপরতাপূর্ণ ব্যয়ও ইসলামের দৃষ্টিতে চরম অপব্যয় রূপে গণ্য হয়ে থাকে।

وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَاتُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا ۝ اِنَّ

الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْٓا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ ط وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا ۝

"তোমার নিকটাত্মীয়কে তার অধিকার পৌঁছে দাও ; মিসকীন ও মুসাফিরকেও। বেহুদা খরচ করো না। বেহুদা খরচকারী শয়তানের ভাই। আর শয়তান তার রব-এর নাফরমান—অকৃতজ্ঞ।"

—সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ২৬-২৭

ইসলাম এ ব্যাপারে কেবল নৈতিক শিক্ষাদান করেই ক্ষান্ত হয়নি—এতটুকু বলাকেই যথেষ্ট মনে করেনি। কৃপণতা ও অপব্যয়ের জঘন্য রূপ ও ধরনকে প্রতিরোধ করার জন্য প্রয়োজনীয় আইনও প্রণয়ন করেছে। এবং ধন বন্টনের ভারসাম্য নষ্টকারী যাবতীয় নিয়ম-রীতিকে বন্ধ করে দিতে চেষ্টা করেছে। ইসলাম জুয়াকে হারাম ঘোষণা করেছে। মদ পান ও খেল-তামাশা, আনন্দ-স্ফূর্তির ব্যয়, বাহুল্যপূর্ণ অনেক বদ অভ্যাসকেই সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করেছে। কেননা তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতিই হচ্ছে সময় ও সম্পদের অপচয়। গান-বাজনার স্বাভাবিক আকর্ষণকে ইসলাম এতদূর পৌঁছতে দেয় না, যেখানে মানুষের এ আকর্ষণকে বহুবিধ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দোষ-ত্রুটির উদ্ভব হওয়ার সাথে সাথে অর্থনৈতিক জীবনেও বিপর্যয় সৃষ্টির কারণ হয়। রূপ ও সৌন্দর্য লিপ্সাকেও বিশেষ এক সীমার মধ্যে নিয়ন্ত্রিত করে। বহু

মূল্যবান পরিচ্ছদ, হীরা-জহরত খচিত অলংকার, স্বর্ণ-রৌপ্য নির্মিত পাত্র, চিত্র ও প্রতিমূর্তি সম্পর্কে নবী করীম স. থেকে যেসব বিধি-বিধান বর্ণিত হয়েছে, তাতে বিশেষ কল্যাণ ও গভীর যুক্তির যথার্থতা নিহিত রয়েছে। এ ব্যাপারে এক বিরাট ও প্রধান কল্যাণময় নীতি এই যে, যে ধন-সম্পদ তোমাদের অসংখ্য গরীব ভাইদের নিম্নতম প্রয়োজন পূরণের জন্য ব্যয় হতে পারে, তাদের জীবনের জন্য অপরিহার্য পণ্য ও দ্রব্যাদি পরিবেশন করতে পারে, তা কেবলমাত্র নিজেদের দেহ ও গৃহ শয্যায় ব্যয় করে দেয়া বস্তুতই কোনো রুচিবোধের পরিচায়ক নয়। তা থেকে বরং নিতান্ত নির্মমতা ও জঘন্য স্বার্থপরতাই প্রমাণিত হয়। মোটকথা নৈতিক শিক্ষা ও দণ্ড বিধান উভয় পন্থায়ই ইসলাম মানুষকে এক সহজ ও সরল জীবনযাপনে অনুপ্রাণিত করে। ইসলাম যেরূপ সহজ ও সরল জীবনযাপন করতে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে, তাতে মানুষের প্রয়োজন প্রবল ও লালসা চরিতার্থ করণের ক্ষেত্র এতদূর প্রশস্ত হতে পারে না যে, মানুষ তার আয় দ্বারা মধ্যম মানের জীবনযাপন করতে সমর্থ হয় না ; বরং স্বীয় স্বাভাবিক পরিধি লংঘন করে অপর লোকের রুযী-রোযগারে ও উপায়-উপার্জনে অংশ গ্রহণের প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। অথবা কেউ যদি মধ্যম মানেরও অধিক উপার্জন করতে পারে, তবুও তার সমস্ত ধন-মাল যে তার নিজেরই জন্য ব্যয় করে ফেলতে হবে এবং মধ্যম মানের কম উপার্জনকারীদের জন্য তা থেকে কিছু ব্যয় করতে পারবে না এমন অবস্থারও সৃষ্টি হওয়া সম্ভব নয়।

❐

আধুনিক অর্থ সমস্যার ইসলামী সমাধান

'ইতিহাসের শিক্ষা' আলোচনা প্রসংগে আমরা যে অর্থনৈতিক সমস্যার উল্লেখ করেছি, ইসলামের উপস্থাপিত মূলনীতিসমূহের ভিত্তিতে সেই সবের সমাধান কিরূপে হতে পারে, বর্তমান পর্যায়ে আমরা তারই আলোচনা পেশ করবো। এ প্রসংগে সর্বপ্রথম কয়েকটি মৌলিক তত্ত্বকথা স্মরণ রাখা আবশ্যক বলে মনে করি।

কয়েকটি মৌলিক তত্ত্ব

ইসলামী সমাজ সংস্থা সঠিকরূপে বুঝার জন্য সর্বপ্রথম একথা জেনে নেয়া আবশ্যক যে, ইসলামী দৃষ্টিভংগিতে আসল গুরুত্ব হচ্ছে ব্যক্তির সমাজ, জাতির বা সমষ্টির নয়। বস্তুত ব্যক্তি-জাতি বা সমষ্টির জন্য নয়, সমষ্টি বা জাতি ব্যক্তির জন্য। আল্লাহর নিকট একটি সমাজ, জাতি বা সমষ্টি সামগ্রিকভাবে জবাবদিহি করতে বাধ্য হবে না, এক এক ব্যক্তি, তার পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যমূলক মর্যাদা সহকারে স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্ত্বা হিসেবেই দায়ী হবে—জবাবদিহি করতে বাধ্য হবে।আর এ ব্যক্তিগত দায়িত্ব ও জবাবদিহির ভিত্তির উপরই মানুষের সমগ্র নৈতিক মূল্য ও মর্যাদা স্থাপিত। সামাজিক জীবনের মূল লক্ষ কেবল সামগ্রিক কল্যাণ নয়, প্রকৃতপক্ষে একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তির কল্যাণই হচ্ছে কাম্য। একটি সমাজ ব্যবস্থার ভাল ও মন্দ—কল্যাণময় ও বিপর্যয়গ্রস্ত হওয়ার প্রকৃত মানদণ্ড হচ্ছে এ প্রশ্নের জবাব যে, ব্যক্তিদের স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্ত্বার উৎকর্ষ ও ক্রমবিকাশ এবং তাদের ব্যক্তিগত যোগ্যতা কর্মক্ষমতার অভিব্যক্তি সাধনে তা কতদূর সাহায্যকারী ও অনুকূল কিংবা প্রতিরোধক। এ কারণে ইসলাম সমাজ-সংগঠনের এমন কোনো ধরন এবং সামগ্রিক কল্যাণের নামে এমন কোনো ব্যবস্থাপনা কিছুতেই সমীচীন বলে গ্রহণ করতে পারে না, যাতে ব্যক্তিগণ তাদের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে ফেলতে ও বিরাট জনতা মুষ্টিমেয় শাসকের হাতে যন্ত্রের অংশবিশেষের মত বন্দী হয়ে পড়তে বাধ্য হতে পারে।

বস্তুর চিন্তা ও কর্মের নিরংকুশ আযাদী লাভ ছাড়া, ব্যক্তি-মানুষের স্বাতন্ত্র্য সঠিকভাবে বিকাশ লাভ করতে পারে না এবং তার ব্যক্তিত্বের সঠিক অভিব্যক্তিও সম্ভবপর নয়। এ উদ্দেশ্যে কেবল মত প্রকাশ, লেখা ও বক্তৃতা, চেষ্টা-সাধনা এবং সভা-সম্মেলন-সংগঠন করার আযাদীই যথেষ্ট নয়, অর্থ

রোযগারের আযাদীও অনুরূপ মাত্রায়ই জরুরী। এটা এমন এক স্বাভাবিক ও স্বতসিদ্ধ সত্য, যা প্রমাণ করার জন্য কোনো লম্বা-চওড়া আলোচনার প্রয়োজন থাকতে পারে না। এর প্রয়োজনীয়তা ও অপরিহার্যতা অনুভব ও অনুধাবন করার জন্য সাধারণ জ্ঞান-বুদ্ধিই যথেষ্ট। একজন পথিক মানুষও একথা ভালো করে জানে যে, যে ব্যক্তির জীবন-জীবিকারই আযাদী নেই, তার কোনো প্রকার আযাদীই থাকতে পারে না। না থাকতে পারে তার মত প্রকাশের স্বাধীনতা, না কথা বলার, না লেখনী চালনার, আর না চেষ্টা ও সাধনার কোনো আযাদী। অতএব, যে সমাজে আল্লাহর এক বান্দার পক্ষে আত্মবিক্রয় না করেই নিজের চেষ্টা-সাধনার ফলে দুই বেলার খাদ্য সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়, মানবতার জন্য কল্যাণকর সমাজ একমাত্র তাই হতে পারে। শিল্পবিপ্লব যুগে এর সুযোগ খুবই সামান্য, ভারী শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান এবং বৃহদায়তন কৃষি ব্যবস্থা, ব্যক্তিগত হস্তশিল্পী, কারিগর, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও কৃষকদের জীবন এতদূর সংকীর্ণ করে দিয়েছে যে, এরা বড়দের সাথে প্রতিযোগিতায় নিজেদের স্বাধীন ব্যবসায় ও পেশাকে সাফল্যের সাথে চালিয়ে যেতে পারে না। কিন্তু এতদসত্ত্বেও যে সমাজে ব্যক্তিগত মালিকানা নীতি স্বীকৃত, তাতে সচ্ছল কর্মক্ষম ধরনের লোকগণ নিজের স্বাধীন শিল্প, ব্যবসায় কিংবা কৃষি প্রতিষ্ঠান কায়েম করার সুযোগ পেতে পারে। অপরদিকে নিঃসম্বল শ্রমজীবীদের জন্যও তাতে অন্তত এতটুকু অবকাশ অবশ্যই থেকে যায় যে, এক ব্যক্তি বিশেষ কোনো প্রতিষ্ঠানে চাকুরী বা মজুরী করতে অনিচ্ছুক হলে অপর যে কোনো দুয়ারে সে উপস্থিত হতে পারে। কিন্তু যেখানে সমগ্র কিংবা বেশীর ভাগ উৎপাদন উপায়কে জাতীয় মালিকানাভুক্ত করা হয়, কিংবা যেখানে ব্যক্তিগত মালিকানার অবকাশ থাকা সত্ত্বেও নাৎসী বা ফ্যাসীবাদী পদ্ধতিতে সমগ্র অর্থনৈতিক কাজকর্মকে রাষ্ট্রের নিরংকুশ দখলের অন্তরভুক্ত করে সর্বগ্রাসী ও সামগ্রিক পরিকল্পনার ভিত্তিতে পরিচালনা করা হয়, সেইরূপ সমাজে জনগণের ব্যক্তিগত আর্থিক স্বাধীনতা কিছুতেই রক্ষা পেতে পারে না। আর তার অবসান হলে সাথে সাথেই মানসিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক আযাদীও সম্পূর্ণরূপে নির্মূল হয়ে যেতে বাধ্য। কাজেই যে জীবনব্যবস্থা মানুষের ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য ভালবাসে এবং মানবীয় ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধনকে উদ্দেশ্যমূলক গুরুত্ব দেয়, তার পক্ষে জমি, কারখানা, ব্যবসায়সমূহের জাতীয়করণ কিংবা রাষ্ট্রের নিরংকুশ প্রভুত্বের অধীন এক কেন্দ্রীয় পরিচালনা অনুযায়ী সমগ্র অর্থনীতির যন্ত্র পরিচালনের উদ্দেশ্যে

রচিত সামাজিক কল্যাণকামী সকল প্রকার নীতি আদর্শ ও মতবাদকে পদাঘাত করা ছাড়া গত্যন্তর থাকতে পারে না।

এ ব্যাপারে ইসলাম ঠিক সেই ভূমিকাই অবলম্বন করেছে। কমিউনিজমের সাথে ইসলামের বিরোধের কারণ কেবল এটাই নয়। কমিউনিষ্টগণ উৎপাদন-উপায়সমূহকে ব্যক্তিগত মালিকানা থেকে টেনে নিয়ে জাতীয় মালিকানার পর্যায়ে ফেলার জন্য বলপ্রয়োগ ও অমানুষিক অত্যাচার-উৎপীড়ন করে থাকে। কিন্তু এ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার জন্য এ যুলুম-পীড়নমূলক লুণ্ঠনের পন্থা যদি অবলম্বন না-ও করা হয় এবং তার পরিবর্তে যদি জমি-জায়গা ও শিল্প-ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠানসমূহকে আইনের সাহায্যে ক্রমশ জাতীয় মালিকানায় পরিণত করার ক্রমবিকাশমান সমাজতন্ত্রের নীতি অবলম্বন করা হয়, তবুও ইসলামের প্রকৃতি তাকে কিছুতেই কবুল করতে পারে না। কেননা, এ ধরনের সমাজনীতি প্রকৃতিগতভাবেই মানবতার পক্ষে মারাত্মক ও ধ্বংসকারী। নাৎসী ও ফ্যাসী পদ্ধতির নিয়মবদ্ধতা (Regimentations) ও পরিকল্পনা পদ্ধতিও ইসলামের প্রকৃতির সম্পূর্ণ বিপরীত। কেননা এসব নীতি আদর্শের সামগ্রিক স্বার্থ যাই হোক না কেন, মানবীয় ব্যক্তিত্বের ক্রমবর্ধন ও পূর্ণত্ব লাভের এটা সুস্পষ্টরূপে পরিপন্থী।

এর আরো একটি দিক বিবেচ্য। ইসলাম মানুষের মধ্যে যেরূপ মানসিকতা ও নৈতিক দৃষ্টিকোণ সৃষ্টি করতে চায়, তার ভিত্তি হচ্ছে আল্লাহভীতি ও আল্লাহর সামনে জবাবদিহি করার ব্যাপারে স্বীয় দায়িত্বের তীব্র অনুভূতি। এ দুটি গুণ যে ব্যক্তি বা সমাজের লোকদের মধ্যে বর্তমান হবে, তাদের উপর যদি সামগ্রিক ও জাতীয় কাজকর্ম করার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়, তাহলে তারা নিজেরাই এমন এক ব্যবস্থা কায়েম করার ও তা পরিচালনা করার জন্য প্রস্তুত হতে পারে না, যাতে নিজেদের ব্যক্তিগত দায়িত্ব বুঝার সাথে সাথে লক্ষ কোটি মানুষের ব্যক্তিগত দায়িত্বভারও নিজেদের স্কন্ধে টেনে নিবে। নবী করীম স. মদীনায় এক দুর্ভিক্ষের সময় একথাই বলেছিলেন। তাঁর সামনে এ নিবেদন করা হয়েছিল যে, দ্রব্যমূল্য তীব্র গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে, আপনি নিজেই দ্রব্যাদির মূল্য নির্দিষ্ট করে দিন। নবী করীম স. এটা করতে সুস্পষ্ট ভাষায় অস্বীকার করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে তিনি তাঁর অসমর্থ পেশ করতে গিয়ে বলেছেন ঃ

اِنِّىْ اُرِيْدُ اَنْ اَلْقَى اللّٰهَ وَلَيْسَ لِاَحَدٍ عِنْدِىْ مَظْلَمَةٌ يَطْلُبُنِىْ بِهَا -

"আমি আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাত করতে চাই যে, আমার বিরুদ্ধে কারো উপর কোনো যুলুম করার একবিন্দু অভিযোগও থাকবে না ও আমার নিকট তা দাবী করা হবে না।"[১]

পরন্তু ইসলাম প্রত্যেকটি ব্যাপারে মানুষকে তার স্বাভাবিক অবস্থার নিকটবর্তী করে রাখতে চায়। জীবনের কোনোদিকেই কৃত্রিমতাকে ইসলাম মাত্রই পসন্দ করে না। বস্তুত মানবীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে স্বাভাবিক অবস্থা এটাই হতে পারে যে, এ যমীনের বুকে আল্লাহ্ জীবন-জীবিকার যত উপায়-উপাদান সৃষ্টি করেছেন, ব্যক্তিগণ তা নিজেদের আয়ত্তাধীন করে নিবে, ব্যক্তিগত পর্যায়ে কিংবা সমষ্টিগতভাবে তার ভোগ-ব্যবহার করবে, তা থেকে উপকার লাভ করবে। দ্রব্যাদি এবং শ্রম ও কাজের পারস্পরিক লেনদেন স্বাধীনভাবে করতে থাকবে। স্মরণাতীত কাল থেকে মানবীয় রুটি-রুযীর কারখানা ঠিক এ পদ্ধতিতেই চলে এসেছে। একজন মানুষ সমাজের মধ্যে বসবাস করতে থাকা অবস্থায় স্বীয় রুটি-রুযীর ব্যাপারে স্বাধীন এবং জীবন ক্ষেত্রে স্থিতিসম্পন্ন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ কেবল এরূপ স্বাভাবিক ব্যবস্থাই হতে পারে। অনভিজ্ঞ ও অসম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন লোকদের সাথে রচিত অসংখ্য ক্ষুদ্র-বৃহৎ মতাদর্শ (Ism)-ই কোনো না কোনো কৃত্রিম সমাজ ও অর্থব্যবস্থা পেশ করে এবং এ ব্যবস্থানুযায়ী মানুষ এক স্বতন্ত্র আত্মাসম্পন্ন, চেতনাময় ব্যক্তিত্ব ও উদ্দেশ্যমূলক গুরুত্বসম্পন্ন সত্তা হিসেবে জীবনযাপনের সুযোগ পায় না। মানুষ সেখানে এক সমাজ যন্ত্রের নিষ্প্রাণ অংশ হয়ে থাকতে বাধ্য হয়।

কৃত্রিম উপায়সমূহের মত বিপ্লবাত্মক কর্মনীতিও ইসলাম সমর্থন করে না। জাহেলিয়াতের যুগে আরববাসীগণ যেসব পন্থায় রুযী-রোযগার করতো তার অনেকগুলোকেই ইসলাম উত্তরকালে হারাম-তীব্রভাবে ঘৃণার্হ বলে ঘোষণা করেছে। কিন্তু পূর্ব থেকে লোকদের নিকট যেসব বিত্ত-সম্পত্তি চলে এসেছিল সেই সম্পর্কে ইসলাম কোনো প্রশ্নই উত্থাপন করেনি—পূর্বেই

---

১. এর অর্থ এই নয় যে, নবী করীম স. দুর্মূল্যতাকে নিরংকুশভাবে চলতে দেয়ার পক্ষপাতী, তার প্রতিরোধ প্রতিবিধানের দিকে কোনো লক্ষই তিনি আরোপ করেননি। প্রকৃতপক্ষে তিনি যে কাজটি করতে অস্বীকার করেছেন, তা হচ্ছে সরকারের কৃত্রিম হস্তক্ষেপের ফলে দ্রব্যমূল্যের জটিল ব্যবস্থাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়া। এ পন্থাকে পরিহার করে তিনি স্বীয় শক্তি ব্যবসায়ী লোকদের নৈতিক সংশোধনের কাজে নিয়োজিত করেছেন। ক্রমাগত ও নিরবচ্ছিন্ন প্রচার ও শিক্ষার সাহায্যে তিনি তাদের মনে এ ধারণা সৃষ্টি করেছেন যে, ইচ্ছাপূর্বক দ্রব্যমূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি করা বিরাট রকমের পাপ। হযরতের এ প্রচার ও শিক্ষা ব্যর্থ যায়নি—এর চমৎকার সুফল লক্ষ করা গেছে। অল্পকালের মধ্যে সমস্ত দ্রব্যের মূল্য স্বাভাবিক পর্যায়ে নেমে আসতে শুরু করে।

হারাম উপায়ে অর্জিত ধন-সম্পদকে বাজেয়াপ্ত করারও কোনো ঘোষণা প্রচার করেননি। এমন কি, সুদখোর, বারবণিতা ও চোর-ডাকাতের পর্যন্ত অতীতের কীর্তি, কার্যকলাপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করার প্রয়োজন মনে করেননি। যার নিকট যাই ছিল, ইসলামের দেওয়ানী আইন তার উপর তার মালিকানা অধিকার স্বীকার করে নিয়েছে। অবশ্য ভবিষ্যতের জন্য সকল প্রকার হারাম উপার্জন উপায় বন্ধ করে দিয়েছে এবং পূর্ববর্তী মালিকানা-সমূহকে ইসলামের মিরাসী আইন ক্রমশ বণ্টিত ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত করে দিয়েছে।

রোগ নিরূপণ

পূর্বোল্লিখিত তত্ত্বসমূহ হৃদয়ংগম করার পরই গ্রন্থের প্রাথমিক আলোচনা-সমূহ একবার স্মরণ করে নিতে হবে। এ গ্রন্থের শুরুতেই আমরা বলেছি যে, শিল্পবিপ্লবের যুগে পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা যদিও স্মরণাতীত কাল থেকে চলে এসে আর্থিক রীতিনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, কিন্তু তার কঠিন বিপর্যয় উদ্ভূত হওয়ার চারটি মৌলিক কারণ শুরু থেকেই বর্তমান থেকে যায় এবং এটাই শেষ পর্যন্ত কঠিন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সেই কারণ চারটি এই ঃ

প্রথম ঃ এ ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালকগণ সেই চিরন্তনী নীতিসমূহের ব্যাপারে অত্যন্ত বাড়াবাড়ি প্রদর্শন করে, অথচ অন্য শিল্প যুগের পক্ষে তা কিছুমাত্র সমীচিন ছিল না।

দ্বিতীয় ঃ তারা সেই চিরন্তনী স্বাভাবিক রীতিনীতির সাথে আরো কয়েকটি ভ্রান্তনীতির সংযোজন করে।

তৃতীয় ঃ স্বভাবসম্মত অর্থব্যবস্থার কতগুলো মূলনীতিকে তারা উপেক্ষা করে, অথচ তা পুঁজিবাদী সমাজের সপ্ত মূলনীতির মতোই অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

অতপর এসব অধ্যায়ে আমরা বিস্তারিতরূপে একথা বলেছি যে, একদিকে সমাজতন্ত্র, কমিউনিজম, ফ্যাসীবাদ ও নাৎসীবাদ এবং অপরদিকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার উদ্ভাবিত ত্রুটি-বিচ্যুতি ও রোগের চিকিৎসার জন্য যে প্রচেষ্টা চালিয়েছে, তা সবই ব্যর্থ হয়েছে কেবলমাত্র এজন্য যে, তাদের কেউই রোগের প্রকৃত ও মূলগত কারণ নির্ণয় করতে সমর্থ হয়নি। একদল প্রাচীনকাল থেকে ব্যবহৃত রীতিনীতিকেই রোগের আসল কারণ মনে করতে লাগলো এবং সেইগুলো বিদূরণের সাথে সাথে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যকেও তারা খতম করে দিল।

অপর দল কেবল অভিযোগ খণ্ডনেই সমস্ত লক্ষ আরোপ করে এবং দোষ ও বিপর্যয়ের মূল কারণসমূহকে যথারীতি বর্তমান থাকতে দেয়া হয়। এর প্রতিষ্ঠিত সমাজব্যবস্থায় ব্যক্তিগত স্বাধীনতা তো থেকে গেল, কিন্তু তা কার্যত সামগ্রিক স্বার্থের দৃষ্টিতে ঠিক ততখানি ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ালো, যতখানি পুঁজিবাদের অন্ধকারাচ্ছন্ন স্তরে তা মারাত্মক ছিল।

এ রোগ নিরূপণ পদ্ধতি সম্পর্কে একটু চিন্তা করলে সহজেই একথা মেনে নিতে হয় যে, প্রকৃত মানবতার জন্য এমন এক বিজ্ঞানসম্মত, সামঞ্জস্যপূর্ণ ও ভারসাম্যযুক্ত অর্থব্যবস্থার প্রয়োজন, যা ঃ

প্রথম ঃ অর্থনীতির স্বাভাবিক মূলনীতিসমূহকে তো বজায় রাখবে—কেননা ব্যক্তিগত আযাদীর জন্য তা অপরিহার্য—কিন্তু তার প্রয়োগের ব্যাপারে সীমাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করার পরিবর্তে ব্যক্তিগণের চেষ্টা-সাধনার আযাদীকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করবে, যার ফলে তারা সামাজিক-সামগ্রিক স্বার্থ ও কল্যাণের দুশমন থাকবে না। শুধু তাই নয়, কার্যত তারা তার খাদেম হয়ে দাঁড়াবে।

দ্বিতীয় ঃ উল্লেখিত স্বাভাবিক নীতিসমূহের সাথে ভুল নীতির সকল প্রকার সংমিশ্রণকেই গোটা অর্থব্যবস্থা থেকে দূরে রাখবে।

তৃতীয় ঃ সেই নীতিসমূহের সাথে সাথে স্বভাবসম্মত অর্থব্যবস্থার অপরাপর মৌলিক নীতিসমূহকে কার্যকরী করবে।

চতুর্থ ঃ ব্যক্তিগণকে সেই স্বাভাবিক মূলনীতিসমূহের বিরুদ্ধতা করতে এবং তাদের প্রকৃত দাবীকে অস্বীকার করে চলতে দিবে না।

ইসলামের প্রতিবিধান

ইসলাম ঠিক এ পন্থাই গ্রহণ করেছে। ইসলাম 'অবাধ অর্থব্যবস্থা'কে 'স্বাধীন অর্থ ব্যবস্থায়' পরিণত করে এবং তাকে কতক বিধি-নিষেধ ও সীমা-সরহদের মধ্যে ঠিক তেমনিভাবে বেঁধে দেয়, যেমন সমাজ ও তামাদ্দুনের অন্যান্য সমগ্র বিভাগে মানবীয় আযাদীকে সীমাবদ্ধ করে দেয়। সেই সাথে আযাদ অর্থব্যবস্থায় বিপর্যয়মূলক পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার বিশেষ প্রভাব ও কুফল সৃষ্টি হওয়ার সকল প্রকার পথকেও সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেয়। ইসলামের মূলনীতিসমূহের ভিত্তিতে কিরূপ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে উঠে, অতপর আমরা তা যথাসম্ভব বিস্তারিতরূপে পেশ করতে চেষ্টিত হবো।

১. জমির মালিকানা ঃ ইসলামে অপরাপর জিনিসের মত জমির উপরও ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকৃত ও সমর্থিত হয়েছে। কোনো জিনিসের উপর

কারো মালিকানা প্রতিষ্ঠিত ও কার্যকরী হওয়ার জন্য যতগুলো আইনগত রূপ নির্দিষ্ট আছে সেই সকল রূপেই জমিও অন্যান্য জিনিসের মতোই একজনের মালিকানাভুক্ত হতে পারে। এর কোনো সীমাও নির্দিষ্ট নেই, এক বর্গগজ থেকে কয়েক সহস্র একর পর্যন্ত যতখানি জমিই হোক না কেন, আইনসম্মত উপায়ে ও নিয়মে কারো মালিকানাভুক্ত হলে, সে অবশ্যই তার বিধিসম্মত মালিক হবে—তা তার বৈধ মালিকানা সম্পত্তিরূপে গণ্য হবে। নিজের জমি যে নিজেরই চাষাবাদ করতে হবে, এ মালিকানার বৈধতার জন্য তারও কোনো শর্ত নেই। বাড়ী-ঘর ও আসবাবপত্র যেমন ভাড়ায় দেয়া যায়, জমিকেও তেমনি ভাড়া হিসাবে লাগানো যেতে পারে। ফসলের শরীকানা নিয়মেও কৃষিকাজ চলতে পারে। ভাড়া ছাড়াই কাউকেও জমি দান করলে, ফসলের ভাগ না নিয়েই কাউকে নিজের জমি চাষ করার জন্য দিলে তা সাদকা বা দানরূপে গণ্য হবে। কিন্তু ভাড়া ও বার্ষিক কেরায়া এবং ফসল বণ্টনের ভিত্তিতে কার্যসম্পাদন করা ব্যবসায়ে অংশীদারী কিংবা কোনো জিনিস ভাড়ায় লাগাবার মতো বিধিসম্মত জায়েয। তবে সামন্তবাদী ব্যবস্থার যেসব দোষ-ত্রুটি আমাদের সমাজে রয়েছে, তা না নিছক জমিদারী পদ্ধতির ফল, না জমির ব্যক্তিগত মালিকানাকে উচ্ছেদ করা তার কোনো চিকিৎসা বা সংশোধন হতে পারে। পরন্তু এ যুগের আধা হেকীমদের প্রস্তাবিত কৃষি সংশোধনের ন্যায় কৃত্রিম বাধ্যবাধকতা আরোপ করায়ও তা কল্যাণকর হয় না। বরং ইসলামী আদর্শের মূলনীতির ভিত্তিতে তার সঠিক চিকিৎসা নিম্নরূপ হতে পারে ঃ

এক ঃ জমি ক্রয়-বিক্রয়ের পথে প্রবর্তিত যাবতীয় বাধা-প্রতিবন্ধকতা দূরীভূত করা এবং দুনিয়ার অন্যান্য সাধারণ জিনিসের মতোই তার লেনদেন সহজসাধ্য করা আবশ্যক।

দুই ঃ কৃষিজীবি ও অকৃষিজীবি শ্রেণীসমূহের মধ্যে স্থায়ী পার্থক্য করার রীতি সকল দিক দিয়ে ও সর্বপ্রকারেই চিরতরে খতম করে দেয়া দরকার।

তিন ঃ আমাদের জীবন ও সমাজে জমির মালিকদের জন্য যে বৈশিষ্টপূর্ণ অধিকারের ব্যবস্থা রয়েছে, তার সবকিছুই আইনত বাতিল করে দেয়া বাঞ্ছনীয়।

চার ঃ জমি-মালিক ও কৃষক-চাষীর পারস্পরিক অধিকার, কর্তব্য ও দায়িত্ব আইনের দৃষ্টিতেই নির্ধারিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। এবং সেই সুনির্দিষ্ট

অধিকার ছাড়া আর কোনো প্রকার অধিকারই কৃষকদের উপর জমির মালিকদের জন্য স্বীকার্য নয়।

পাঁচ ঃ জমিদারী সহজ অর্থে জমির মালিকানা কেবলমাত্র একটি বিশেষরূপেই অবশিষ্ট থাকতে দেয়া হবে, মালিক ও কৃষকের মাঝখানে অবশিষ্ট ব্যবসায়ে সমান শরীকদ্বয়ের মধ্যবর্তী সম্পর্কের অনুরূপ সম্পর্কই থাকতে দেয়া হবে। এছাড়া যেসব জমিদারী যুলুম-পীড়ন ও শোষণের হাতিয়ার হয়ে কাজ করে 'রাষ্ট্রের অধীন রাষ্ট্র' হওয়ার সুযোগ পেয়ে বসে কিংবা যাকে অন্যায়ভাবে রাজনৈতিক 'ক্ষমতা' লাভের উপায়ও বানিয়ে নেয়া হয়। তা যেহেতু বৈধ ও সংগত জমিদারী আওতা বহির্ভূত এজন্য তা সঙ্গত জমিদারীও জায়েয মালিকানার অনুরূপ সংরক্ষণ লাভ করতে পারবে না।

ছয় ঃ মীরাস বন্টনের ব্যাপারে যেসব ইসলাম বিরোধী রসম-রেওয়াজ চালু রয়েছে, তা সবই খতম করে দিতে হবে। জমি মালিকদের বর্তমান সম্পত্তি শরীয়াতের বিধান অনুযায়ী তাদের জীবিত উত্তরাধিকারদের মধ্যে বণ্টন করতে হবে এবং ভবিষ্যতেও কৃষি সম্পত্তির ক্ষেত্রে ইসলামের মিরাসী আইন যথাযথরূপে কার্যকরী করতে হবে।

সাত ঃ কৃষি জমি অকর্ষিত অবস্থায় ফেলে রাখার উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে হবে। যেমন, সরকার যেসব জমি কাউকে বিনামূল্যে বন্দোবস্ত দিয়ে থাকলেও তিন বছরের অধিককাল অকর্ষিত রাখা হলে এ 'দান' বাতিল করতে হবে। অনুরূপভাবে ক্রয় করা জমিও বেকার ফেলে রাখলে এক বিশেষ মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর তার উপর কর ধার্য করতে হবে।

আট ঃ জমি-মালিক ও কৃষক-চাষীদের উৎপন্ন ফসল থেকে এক নির্দিষ্ট অংশ যাকাতের জন্য নির্দিষ্ট খাতসমূহে ব্যয় করার উদ্দেশ্যে গ্রহণ করতে হবে।

নয় ঃ আধুনিক বৈজ্ঞানিক পন্থায় বৃহদায়তন কৃষিকার্য সম্পাদন করতে হলে পারস্পরিক সাহায্যের এমন ধরনের সংস্থা কায়েম করতে হবে যাতে ক্ষুদ্রায়তন জমি মালিকগণ নিজেদের ব্যক্তিগত মালিকানা অধিকার বজায় রেখেই পারস্পরিক সম্মতি ও সন্তোষের ভিত্তিতে নিজেদের সম্পত্তিকে বৃহদাকার কৃষিক্ষেত্রে পরিণত করে নিবে এবং সকলে মিলিতভাবে একটি সংস্থা হিসেবে তার কাজ সম্পন্ন করবে।

এসব সংশোধনী ব্যবস্থা কার্যকরী হলে জমিদারী ও বৃহদায়তন জমি-মালিকানার এমন কোনো ত্রুটিই অবশিষ্ট থাকতে পারে না, যা যুক্তিসঙ্গতভাবে পেশ করা যেতে পারে।

২. অন্যান্য উৎপাদন উপায় ঃ ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যবহারিক পণ্য ও উৎপাদন উপায়ের মাঝে কোনোই পার্থক্য সমর্থিত নয় ; কাজেই এক ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মালিকানা চলবে, আর অপর ক্ষেত্রে তা বৈধ হবে না, এটা কখনো গ্রহণযোগ্য নয়। একজন মানুষ অপর লোকদের জন্য তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় কোনো জিনিস তৈরি কিংবা সংগ্রহ করবে ও তার নিকট তা বিক্রি করবে, ইসলাম একে বিধিসম্মত কাজ বলে মনে করে। এ কাজ সে নিজ হাতেও করতে পারে এবং অপর লোকদের দ্বারা মজুরীর বিনিময়েও করাতে পারে। এরূপ পণ্য উৎপাদন বা সংগ্রহ করার কাজে যেসব কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি ও কর্মক্ষেত্র ব্যবহার করবে, সেসব কিছুরই মালিক হতে পারে। এটা যেমন শিল্পবিপ্লবের পূর্ববর্তী পর্যায়ে বিধিসম্মত ছিল, তেমনি বিধিসম্মত তার পরবর্তী অধ্যায়েও। কিন্তু অবাধ শিল্প ব্যবসায় না পূর্বে কখনো বৈধ ছিল, না এখন তা কোনো দিক দিয়েই সমীচীন হতে পারে। ইসলামের বিধান অনুযায়ী তাকে নিম্নলিখিত নিয়ম-প্রণালী মেনে চলতে বাধ্য করা কর্তব্য ছিল—এখনো তাই কর্তব্য।

এক ঃ যে শৈল্পিক আবিষ্কার উদ্ভাবন মানবীয় শক্তি-শ্রম-মেহনতের পরিবর্তে যন্ত্রশক্তি ব্যবহারের পথ উন্মুক্ত করে দেয়, তা শিল্প, কৃষি ও ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার পূর্বে তা কত সংখ্যক মানুষের জীবিকা নষ্ট করবে এবং সেই বেকার লোকদের জীবিকার ব্যবস্থা কি হবে, তার সুষ্ঠু বিচার-বিশ্লেষণ করা একান্ত আবশ্যক—এটা না করে উক্ত আবিষ্কার উদ্ভাবন ব্যবহারের অনুমতি কিছুতেই দেয়া যেতে পারে না।

দুই ঃ শ্রমিক মালিককে পারস্পরিক অধিকার, কর্তব্য ও কাজের শর্ত ইত্যাদির সবিস্তার নির্ধারণের কাজ অবশ্যই পক্ষদ্বয়ের পারস্পরিক সমঝোতার উপর ন্যস্ত করতে হবে। কিন্তু সরকার নিজ থেকে ইনসাফের কয়েকটি মৌলিক নিয়ম অবশ্যই নির্দিষ্ট করে দিবে। যেমন একজন শ্রমিকের নিম্নতম বেতন বা মজুরীর হার, সর্বোচ্চ কার্য সময়, রোগের চিকিৎসা, দৈহিক অঙ্গহানির ক্ষতিপূরণ এবং সম্পূর্ণ অকর্মণ্য হয়ে গেলে পেনশনের নিম্নতম অধিকার প্রভৃতি ব্যাপারসমূহ।

তিন ঃ শ্রমিক মালিকের পারস্পরিক বিরোধ মীমাংসার দায়িত্ব সরকারকে নিজ হাতে গ্রহণ করতে হবে এবং সেজন্য পারস্পরিক সমঝোতা, সালিসী ও আদালতের এমন একটি প্রণালী নির্দিষ্ট করে দিবে, যার ধর্মঘট ও লক আউট (Lock-out) ঘোষণা করার মতো কোনো পরিস্থিতি দেখা দিতে না পারে।

চার ঃ ব্যবসা-বাণিজ্যে সঞ্চয় করা (Hoarding)[১] ফটকাবাজারী (Speculation), ব্যবসায়ী জুয়া ও অদৃশ্য কেনা-বেচার পথ চূড়ান্তভাবে বন্ধ করে দিতে হবে। সেই সাথে যেসব পন্থায় দ্রব্যমূল্যের উপর কৃত্রিম প্রভাব বিস্তার করা হয়, সেগুলোকে আইনের সাহায্যে বন্ধ করে দিতে হবে।[২]

পাঁচ ঃ উৎপন্ন দ্রব্য ও ফসল ইচ্ছাকৃতভাবে নষ্ট করে দেয়াকে অপরাধরূপে গণ্য করতে হবে।

ছয় ঃ শিল্প ও ব্যবসায়ের সকল বিভাগকেই যথাসাধ্য প্রতিযোগিতার জন্য উন্মুক্ত ও অবাধ করতে হবে। একচেটিয়া ব্যবসা চালাবার সুযোগ দিয়ে কোনো ব্যক্তি বা দলকে বিশেষ বৈষম্যমূলক অধিকার দেয়া যেতে পারে না এবং অপরদের তা থেকে বঞ্চিত করা যেতে পারে না।

সাত ঃ যেসব শিল্প ও ব্যবসায় জনগণের নৈতিক চরিত্র কিংবা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর, তা চলার অনুমতি দেয়া যেতে পারে না। এ ধরনের কোনো জিনিস যদি কোনো দিক দিয়ে অপরিহার্য বিবেচিত হয়, তবে তার শিল্প ও ব্যবসায়ের উপর প্রয়োজনানুরূপ প্রতিবন্ধকতা ও নিয়ন্ত্রণ বসাতে হবে।

আট ঃ সরকার অবশ্য নাৎসী নিয়ম অনুযায়ী যাবতীয় শিল্প ব্যবসায়কে সম্পূর্ণভাবে নিজস্ব অধিকার (Control) আনয়ন করবে না, কিন্তু পথনির্দেশ (Direction) ও সামঞ্জস্য বিধানের (Co-ordination) কাজ অবশ্যই আনজাম দিবে যেন বিশ্বের শিল্প ও ব্যবসায় ভ্রান্ত পথে চলে না যায় এবং অর্থনৈতিক জীবনের সকল বিভাগের মধ্যেই পূর্ণ সামঞ্জস্য স্থাপিত হয়।

নয় ঃ ইসলামে মিরাসী আইনের সাহায্যে জমি-মালিকদের সম্পত্তির মত শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের সঞ্চিত পুঞ্জিকৃত অর্থ-সম্পদকেও নিরন্তর বণ্টন করতে হবে। যেন কোনো স্থায়ী ধনী শ্রেণীর সৃষ্টি হতে না পারে।

দশ ঃ কৃষিজীবিদের ন্যায় ব্যবসায়ী, শিল্পপতি ও কারবারী লোকদের আমদানীর একটি অংশ যাকাত ব্যয়ের খাতসমূহে ব্যয় করার উদ্দেশ্যে অবশ্যই আদায় করতে হবে।

---

১. মূল্য বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি তিল তিল করে জমা করা ও বিক্রি না করে আটক করে রাখাকেই ইসলামী পরিভাষায় বলা হয় 'ইহতিকার'।

২. ইসলামী শরীয়াতের ব্যবসা সংক্রান্ত আইন মূলত অর্থনৈতিক জীবন সংশোধনের এক গুরুত্বপূর্ণ উপায়। কিন্তু দুনিয়ার মানুষ তাকে প্রয়োগ করে কল্যাণ লাভ করার চেষ্টা করেনি। বরং স্বয়ং মুসলিম সমাজই তার প্রতি চরম অপরাধমূলক অবজ্ঞা প্রদর্শন করেছে। এখানে এ আইনের বিস্তারিত বিবরণ পেশ করার অবকাশ নেই। এ সম্পর্কে স্বতন্ত্র একখানা গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করা হবে ইনশাআল্লাহ। এখানে প্রসঙ্গত শুধু এতটুকু বলাই উদ্দেশ্য যে, সামগ্রিক স্বার্থের পক্ষে ব্যবসায়ের যেসব নিয়ম-পন্থা মারাত্মক ও ক্ষতিকর তা সবই আইনত বন্ধ করে দেয়া আবশ্যক।

ইসলামের অর্থনৈতিক বিধান

অর্থব্যবস্থার ক্ষেত্রে ইসলাম ব্যক্তির অধিকার সমর্থন করে। একজন ব্যক্তি তার আয়ের প্রয়োজনাতিরিক্ত অংশ সঞ্চয় করবে কিংবা অপরকে ঋণ বাবদ দান করবে, অথবা নিজের কোনো ব্যবসায় নিয়োগ করবে বা কোনো শিল্প ব্যবসায়ে নিজের পুঁজিদানে তার লাভ লোকসানের অংশীদার হবে। ইসলাম এতে কোনো বাধা দেয় না। যদিও উদ্বৃত্ত অর্থ সমাজ কল্যাণমূলক কাজে নিয়োগ করাই ইসলামের দৃষ্টিতে উত্তম কাজ ; কিন্তু তা সত্ত্বেও উপরোক্ত চার ধরনের কাজকেও বিধিসম্মত বলে ঘোষণা করে। কিন্তু সেইজন্য নিম্নলিখিত নিয়ম-বিধি যথাযথরূপে পালন করা অবশ্যই কর্তব্য।

এক ঃ অর্থ-সম্পদ সঞ্চয় করে রাখা হলে তা থেকে বার্ষিক শতকরা ২.৫০ টাকা হিসেবে যাকাত বাবদ অবশ্যই আদায় করতে হবে এবং যাকাত ব্যয়ের খাতসমূহের কাজে তা ব্যয় করতে হবে। সে যখন মৃত্যুমুখে পতিত হবে তখন তার সমগ্র সম্পদ ইসলামের মিরাসী আইন অনুযায়ী তার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বণ্টন করতে হবে।

দুই ঃ কাউকে ঋণ বাবদ দেয়া হলে সে কেবল নিজের দেয়া মূল টাকাই ফেরত নিতে পারবে। সে কোনো অবস্থায়ই সুদ গ্রহণ করার অধিকারী হবে না। এ ঋণ গ্রহণকারী তা নিজস্ব ব্যয় নির্বাহের জন্য গ্রহণ করুক, অথবা কোনো শিল্প বা বাণিজ্যে নিয়োগ করার উদ্দেশ্যেই গ্রহণ করুক, সবই সমান কথা, অনুরূপভাবে প্রদত্ত ঋণ আদায়ের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য ঋণ গ্রহীতার নিকট থেকে কোনো জমি বা সম্পত্তি যদি বন্ধক রেখে থাকে, তবে সে তা থেকে কোনো ফায়দাই গ্রহণ করতে পারবে না। ঋণের বিনিময়ে যে কোনো ফায়দাই হোক—গ্রহণ করলেই তা সুদ হবে। কাজেই তা কোনোরূপেই গ্রহণ করা যেতে পারে না। এ মাসয়ালার ভিত্তিতে সহজেই এ 'কিয়াস' করা যেতে পারে যে, নগদ ক্রয়ের ব্যাপারে পণ্যের এক প্রকার মূল্য হওয়া এবং বাকী ক্রয়ের ব্যাপারে অন্য প্রকার মূল্য নির্ধারণ করাও জায়েয নয়।

তিন ঃ শিল্প, ব্যবসায় কিংবা কৃষিকাজে সরাসরি পুঁজি বিনিয়োগ করা হলে জমি ও অন্যান্য উৎপাদন উপায় প্রসঙ্গে বর্ণিত নিয়ম প্রণালী অবশ্যই মেনে চলতে হবে।

চার ঃ অংশীদারমূলক কারবার হলে লাভ-লোকসানে উভয়কেই সমান হারে শরীক হতে হবে। একটি নির্দিষ্ট হারে উভয়কেই অংশীদার হতে হবে। শরীকদারীমূলক যে ব্যবসায়ে পুঁজি মালিক কেবল মুনাফারই ভাগীদার হবে ও নির্দিষ্টহার অনুযায়ী অবশ্যই মুনাফা পাবে-(লোকসানের কোনো চাপ তাকে গ্রহণ করতে হবে না) এমন সকল কারবারই আইনত অগ্রাহ্য ও অবৈধ হবে।

যাকাত

ইসলাম সমাজ ও রাষ্ট্রের উপর নাগরিকদের জন্য কাজ-রোযগার সংগ্রহ করে দেয়ার দায়িত্ব অর্পণ করেনি। কেননা যাবতীয় উৎপাদন উপায় রাষ্ট্রায়ত্বকরণ—অন্তত নাৎসী পদ্ধতির ন্যায় আধিপত্য স্থাপন ছাড়া কাজ সংগ্রহ করে দেয়ার দায়িত্ব পালন করা কখনো সম্ভব হতে পারে না। কিন্তু তার ভ্রান্তি ও মারাত্মক ক্ষতির কথা পূর্বেই বিবৃত হয়েছে। এতদসত্ত্বেও সমাজ জীবনে ব্যক্তিগণকে সম্পূর্ণরূপে তাদেরই নিজস্ব উপায়-উপকরণ ও নিজস্ব অবস্থার উপর ছেড়ে দেয়া এবং বিপদগ্রস্ত লোকদের তত্ত্বাবধান করার কোনো দায়িত্বই গ্রহণ না করা ইসলাম সমর্থন করতে পারে না। ইসলাম একদিকে প্রত্যেকটি মানুষের উপর ব্যক্তিগতভাবেই এ নৈতিক দায়িত্ব চাপিয়ে দেয় যে, আপন-পর যে কোনো ব্যক্তিকেই সাহায্য-সহায়তার মুখাপেক্ষী দেখতে পাবে, সে তার সাধ্যানুসারে তার সাহায্য করবে। অপরদিকে শিল্পপতি, ব্যবসায়ী ও জমি মালিকদের নিকট ইসলাম এ দাবী করে যে, তাদের কাজ-কর্মে যাদেরকেই নিযুক্ত করবে, তাদের অধিকার যেন তারা যথাযথভাবে আদায় করে। এসবেরও উর্ধে সমগ্র সমাজ ও গোটা রাষ্ট্রসংস্থার উপর দায়িত্ব অর্পণ করেছে যে, তার শাসন পরিধির মধ্যে কোনো ব্যক্তিই যেন নিম্নতম মৌলিক প্রয়োজন থেকে বঞ্চিত থাকতে না পারে। সমাজের মধ্যে যারা বেকার—রুযী-রোযগার বঞ্চিত, অথবা কোনো অস্থায়ী কারণে কর্ম ক্ষমতাহীন কিংবা স্থায়ীভাবেই অক্ষম বা কোনো আকস্মিক বিপদ ও দুর্ঘটনায় পড়েছে, তাদের সকলকেই প্রয়োজনীয় সাহায্য ও আশ্রয়দান রাষ্ট্রসংস্থার দায়িত্ব। অসহায় শিশুদের লালন-পালনের ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের কর্তব্য। এমনকি ঋণগ্রস্ত ও ঋণ আদায়ে অসমর্থ ব্যক্তিকে ঋণ মুক্তির ব্যবস্থা করাও সরকারেরই দায়িত্বভুক্ত। বস্তুত এটা সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের (Social Insurance) এক ব্যাপক পরিকল্পনা বিশেষ এবং এটা সরাসরি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় কার্যকরী হওয়া আবশ্যক। এ কাজের জন্য আর্থিক উপায় সংগ্রহের জন্য ইসলাম নিম্নোক্ত পন্থাসমূহ পেশ করেছে ঃ

এক ঃ যে ব্যক্তিই এক নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ-সম্পদ থেকে অধিক পুঁজি সঞ্চয় করে রেখেছে, তাকেই নিজ পুঁজি থেকে বার্ষিক শতকরা ২.৫০ টাকা হিসেবে যাকাত বাবদ প্রদান করবে।

দুই ঃ প্রত্যেক জমি মালিক ও কৃষক-চাষী স্বীয় স্বাভাবিক সেচকৃত জমির ফসলের শতকরা দশ ভাগ এবং কৃত্রিম উপায়ে সেচিত জমির ফসলের শতকরা পাঁচ ভাগ অংশ অবশ্যই এ খাতে দান করবে।

তিন ঃ প্রত্যেক শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী প্রত্যেক বছরান্তে স্বীয় ব্যবসায়ী পণ্য মূল্যের শতকরা ২.৫০ টাকা দান করবে।

চার ঃ প্রত্যেক পশু পালক এক বিশেষ সংখ্যার অধিক পশু পালন করলে একটি নির্দিষ্ট হার ও হিসাব অনুযায়ী স্বীয় পশু সম্পদের একটি অংশ প্রত্যেক বছরই সরকারী বায়তুলমালে জমা করে দিবে।

পাঁচ ঃ খনিজ দ্রব্য ও প্রোথিত সম্পদের এক-পঞ্চমাংশ এ খাতে গ্রহণ করতে হবে।

ছয় ঃ কোনো প্রকার যুদ্ধ সংঘটিত হলে গনীমাতের মাল থেকে শতকরা ২০ ভাগ এ উদ্দেশ্যে গ্রহণ করা হবে।

এসব উপায়ে সঞ্চিত সম্পদ কুরআনে বর্ণিত যাকাত ও এ খুমুস-এর খাতসমূহে ব্যয় করার জন্য 'রিজার্ভ' রাখা হবে। এ খাতসমূহের মধ্যে একটি বিরাট অংশ হচ্ছে পূর্ব বর্ণিত সামাজিক নিরাপত্তা পরিচালনা।

সীমাবদ্ধ সরকারী হস্তক্ষেপ

সরকার নিজেই শিল্পপতি, ব্যবসায়ী কিংবা জমি মালিক হয়ে বসবে, ইসলাম এটা নীতিগতভাবেই পসন্দ করে না। ইসলামের দৃষ্টিতে কেবল পরিচালনা করা, ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত করা, বিপর্যয়, ক্ষতি ও অশান্তি দূরীভূত করা ও সামাজিক সামগ্রিক কল্যাণ বিধানই সরকারের কাজ হওয়া উচিত। কেননা রাজনৈতিক শক্তি ও ক্ষমতার সাথে ব্যবসায় কার্য একত্রিত হওয়ার পরিণাম যে কত খারাপ তার কয়েকটি বাহ্যিক ফায়দার খাতিরে তা বরদাশত করা কিছুতেই সম্ভব নয়। তবে যেসব শিল্প ও কারবার জাতীয় জীবনের জন্য অপরিহার্য ; কিন্তু ব্যক্তিগণ তা পরিচালনা করতে প্রস্তুত নয়, কিংবা তা ব্যক্তিগত মালিকানাধীন চললে মূলত সামাজিক সামগ্রিক স্বার্থের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা, কেবল সেই ধরনের কাজই ইসলাম সরকারী ব্যবস্থায় চালাবার

অনুমতি দেয়। এ ধরনের কারবার ছাড়া অন্যান্য শিল্প ব্যবসায়ের কাজে যদি দেশের উন্নয়ন ও কল্যাণ উদ্দেশ্যে সরকার নিজে শুরু করে তবুও তাকে এক বিশেষ সীমা পর্যন্ত সফলতার সাথে চালিয়ে তাকে ব্যক্তিগতভাবে চালাবার জন্য ব্যক্তিদের হাতে অর্পণ করাই কর্তব্য হবে।

❒

ভারসাম্যপূর্ণ অর্থব্যবস্থার চারটি মূলনীতি

ইতিপূর্বে 'আধুনিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থা'র আলোচনায় আমরা অর্থনীতি বিষয়কে যে সাতটি সম্ভব-সম্মত মূলনীতির উল্লেখ করেছি, তার সাথে যদি উপরে বর্ণিত সীমা, নিয়ম-প্রণালী সংশোধনমূলক ব্যবস্থাসমূহের সমন্বয় সৃষ্টি করা যায়, তাহলে এটা দ্বারা সামন্তবাদ ও পুঁজিবাদের যাবতীয় দোষ-ক্রুটি মূলোৎপাটন সম্ভব হতে পারে। উপরন্তু তার ভিত্তিতে এমন এক ভারসাম্যপূর্ণ অর্থব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে যাতে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য, আযাদী ও সামগ্রিক কল্যাণ উভয়েই সঠিকরূপে অনাবিল ইনসাফ সহকারে সংস্থাপিত হবে কিন্তু তাতে বর্তমান শিল্পবিপ্লবের অগ্রগতি কিছুমাত্র ব্যাহত হবে না।

এ ভারসাম্যপূর্ণ অর্থব্যবস্থার মূলনীতি চারটি এখানে উল্লেখ করা যাচ্ছে ঃ

এক ঃ স্বাধীন অবাধ অর্থব্যবস্থা—কয়েকটি আইনগত ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত নিয়ন্ত্রণ ও সীমা নির্ধারণ সহকারে।

দুই ঃ যাকাত ফরয হওয়া।

তিন ঃ মিরাসী আইন।

চার ঃ সুদ হারাম করণ।

বর্তমানকালের অবাধ পুঁজিতন্ত্রের বিপর্যয় এবং কমিউনিজম ও ফ্যাসীবাদের অভিশাপ যাদের সামনে উদঘাটিত, তারা সকলেই উল্লেখিত মূলনীতি চারটির প্রথমটিতে নীতিগতভাবে সমর্থন করতে শুরু করেছে। অবশ্য তার বিস্তারিত ব্যাপারে লোকদের মনে এখনো কিছুটা দ্বিধা ও সমস্যা বর্তমান রয়েছে। কিন্তু আমাদের আশা এই যে, এ অধ্যায়ের জমি ও অন্যান্য উৎপাদন উপায় সম্পর্কিত আলোচনায় আমরা যাকিছু বলেছি, তা পাঠ করার ফলে সেই দ্বিধা ও সমস্যাবোধ দূরীভূত হবে। আমাদের 'জমির মালিকানা' নামক অপর এক গ্রন্থও এ জটিলতা ও দ্বিধা দূরীভূত করতে যথেষ্ট সাহায্য করবে।

দ্বিতীয় মূলনীতির গুরুত্ব বর্তমানে দুনিয়াবাসীর সামনে প্রায় উঘাটিত হয়ে উঠেছে। কমিউনিজম, ফ্যাসীবাদ ও পুঁজিবাদী গণতন্ত্র এ মতবাদত্রয় সামাজিক নিরাপত্তার যে বিরাট ব্যাপক ব্যবস্থা পেশ করেছে, যাকাত তার তুলনায় অনেক বেশী ব্যাপকায়তন সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে সক্ষম। কিন্তু যাকাতের বিস্তারিত বিধান অজ্ঞাত থাকার কারণে মানব মনে এ প্রসঙ্গেও বহু জটিলতা সৃষ্টি হয়। লোকদের পক্ষে এটা এক দুর্বোধ্য

ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় যে, আধুনিক রাষ্ট্রের অর্থব্যবস্থায় যাকাত ও 'খুমুস' কিভাবে সামঞ্জস্য সহকারে স্থাপিত হতে পারে। এ সম্পর্কে 'যাকাতের বিধান' শীর্ষক পুস্তিকা তাদের মনে পরম প্রশান্তি সৃষ্টি করতে সমর্থ হবে।

তৃতীয় ভিত্তি সম্পর্কে ইসলাম দুনিয়ার অন্যান্য সকল প্রকার আইন থেকে স্বতন্ত্রভাবে নিজস্ব এক পথ ও পন্থা গ্রহণ করেছে। পূর্বে তার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে লোকেরা ওয়াকিবহাল ছিল না, এ কারণে তারা সেই সম্পর্কে নানাবিধ প্রশ্ন ও আপত্তি উত্থাপন করতো। কিন্তু এখন ক্রমশ সমগ্র মানব সমাজ এ দিকে ঝুঁকে পড়তে শুরু করেছে। এমনকি রুশীয় কমিউনিজমও তার অনুকরণ করতে বাধ্য হয়েছে।[১]

কিন্তু ইসলামের অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় এ চতুর্থ ভিত্তির যৌক্তিকতা উপলব্ধি করার ব্যাপারে বর্তমানকালের লোকদের বিশেষ অসুবিধাবোধ হচ্ছে। বুর্জোয়া অর্থবিজ্ঞানে বিগত শতাব্দী থেকে এ চিন্তা গভীরভাবে শিকড় গেড়ে বসেছে যে, সুদকে হারাম মনে করা একটা মানসিক উচ্ছ্বাস মাত্র এবং সুদ ব্যতিরেকে কাউকে কোনো ঋণ দেয়া নিছক এক সৌজন্যমূলক সুবিধাদান মাত্র। আর ধর্ম অযথা বাড়াবাড়ি করতে গিয়েই এরূপ দাবী করে বসেছে। নতুবা যৌক্তিকতার দৃষ্টিতে সুদ সম্পূর্ণ বুদ্ধিগম্য ও যুক্তিসঙ্গত জিনিস, অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে তা কোনো আপত্তিকর বিষয় নয় কেবল তাই নয়, কার্যত তা অত্যন্ত উপকারী ও জরুরী জিনিসও। এ ভ্রান্ত মতাদর্শ ও তার প্রবল প্রচারণার প্রভাবেই আধুনিক পুঁজিবাদের সকল দোষ-ক্রটি তো সমালোচকদের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে। কিন্তু সর্বাপেক্ষা প্রধান মৌলিক ক্রটিপূর্ণ ব্যবস্থার (সুদ) উপর কারো দৃষ্টি পড়ে না। এমনকি রাশিয়ার কমিউনিষ্টরাও পুঁজিবাদের এ শ্রেষ্ঠ শয়তানী রীতিকে বৃটেন ও আমেরিকার মতোই লালন-পালন করছে। এখানেই শেষ নয়, যে মুসলিমগণ ছিল দুনিয়ায় সুদের সবচেয়ে বড় শত্রু তারাই আজ পশ্চিমী দেশের এ ভ্রান্তিকর প্রচারণার প্ররোচনায় মারাত্মকভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে পড়েছে। আমাদের পরাজিত মনা ধার্মিক লোকদের মধ্যে এ ভুল ধারণা বিস্তার লাভ করেছে যে, সুদ কোনো আপত্তিকর

১. সোভিয়েট রাশিয়ার নবতর মিরাসী আইনে সন্তান, স্ত্রী, স্বামী, পিতা-মাতা, ভাই-ভগ্নি ও পালিত সন্তানকে উত্তরাধিকারী করে দেয়া হয়েছে। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের বিষয়-সম্পত্তি অভাবগ্রস্ত নিকটাত্মীয় ও সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের নামে অসিয়ত বা উইল করে দিয়ে যেতে পারে এ নিয়মও করে দেয়া হয়েছে। তবে আত্মীয়দের অধিকার অগ্রগণ্য। সেই সাথে অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান কিংবা গরীব উত্তরাধিকারীদের বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে অসিয়ত করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এ আইন দেখে কোনো ব্যক্তিই একথা ধারণা না করে পারে না যে, 'কমিউনিষ্ট প্রগতি পন্থীরা' ১৯৪৫ সনে সেই আইনের দিকে প্রত্যাবর্তন করেছে, যা রচিত হয়েছিল ৬২৫ সনে।

বিষয় কেবল তখনি হতে পারে, যখন তা নিজের প্রয়োজনে ব্যয়ের উদ্দেশ্যে ঋণগ্রহণকারীদের নিকট থেকে গ্রহণ করা হয়। কিন্তু শিল্প ব্যবসায়ে নিয়োগের উদ্দেশ্যে গৃহীত ঋণে সুদের লেনদেন করা সম্পূর্ণ যুক্তিভিত্তিক, সংগত ও সমীচীন, তা পবিত্র ও হালাল। কাজেই দীন ইসলাম, নৈতিকতা, জ্ঞান-বুদ্ধি ও অর্থবিজ্ঞানের মূলনীতির বিচারে তাতে কোনো প্রকারেই কোনো দোষ থাকতে পারে না। এছাড়া আরো কতগুলো আত্মতুষ্টির ব্যাপারও রয়েছে। মনে করা হচ্ছে যে, প্রাচীনকালের বেনিয়া মহাজনদের সুদ খাওয়া ও আধুনিককালের সুদভিত্তিক ব্যাংক ব্যবস্থা এ দুটি এক জিনিস নয়। আরো মনে করা হচ্ছে যে, এসব ব্যাংকের 'পরিচ্ছন্ন' কারবার সম্পূর্ণ পবিত্র কাজ, তার সাথে সকল প্রকারের সম্পর্ক স্থাপন করাই সঙ্গত।

কিন্তু এসব ও এ ধরনের যাবতীয় ভ্রান্তিবোধ থেকে যারা মুক্তিলাভ করেছে তারাও বুঝতে পারছে না যে, সুদকে আইনত বন্ধ করে দেয়ার পর এ যুগে অর্থব্যবস্থার পরিচালনা কিভাবে সম্ভব হতে পারে।

এসব বিষয়ে স্বতন্ত্র এক গ্রন্থ রচনা করা আবশ্যক। এ ক্ষুদ্র পুস্তকে তার বিস্তারিত বিবরণ দানের অবকাশ নেই। আমার গ্রন্থ 'সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং' এসব বিষয়ে আলোচনার জন্যই নির্দিষ্ট রয়েছে; কাজেই যারা এ সম্পর্কিত ভুল ধারণা দূর করতে চান, তাঁরা যেন 'সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং' নামক পুস্তকখানি অধ্যয়ন করেন।

সমাপ্ত

আমাদের প্রকাশিত কিছু বই

* সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং - সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী র.
* অর্থনৈতিক সমস্যার ইসলামী সমাধান - সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী র.
* ইসলামী অর্থব্যবস্থার মূলনীতি - সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী র.
* পুঁজিবাদ বনাম ইসলাম - সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী র.
* ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পদ বন্টন - মুফতী মুহাম্মদ শফী
* যাকাতের ব্যবহারিক বিধান - এ. জে. এম. বদরুদ্দোজা
* যাকাত দারিদ্র বিমোচনই নয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের চালিকাশক্তি - মুহাম্মদ হেদায়াতুল্লাহ